অমৃতের সন্ধানে

অমৃতের সন্ধানে

(মুক্তির অন্বেষণের অপূর্ব কাহিনী)

মূল রচনা ও বাংলা রূপান্তর

শ্রীমতি এডা লী

সূচিপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
১। প্রথম অধ্যায় — জন্ম, বিবাহ ও বৈধব্য	.....	৫
২। দ্বিতীয় অধ্যায় — জগন্নাথের মন্দিরে	.....	৮
৩। তৃতীয় অধ্যায় — রামেশ্বরের মন্দিরে	.....	১১
৪। চতুর্থ অধ্যায় — পথের দুঃখ-কষ্ট	.....	১৫
৫। পঞ্চম অধ্যায় — সন্ন্যাসিনী চন্দ্রলীলা	....	২০
৬। ষষ্ঠ অধ্যায় — প্রতারণা প্রকাশিত	.....	২৪
৭। সপ্তম অধ্যায় — শৃঙ্খল মোচন	.....	২৯
৮। অষ্টম অধ্যায় — অর্থ উপার্জন ও ধর্ম প্রচার	.....	৩৭
৯। নবম অধ্যায় — নিজের ভাইকে বাপ্তিস্ম দান	.....	৪১
১০। দশম অধ্যায় — স্ত্রীলোকের কি প্রচার করা উচিত?	.....	৪৬

প্রথম অধ্যায়
জন্ম, বিবাহ ও বৈধব্য

বহু বৎসর পূর্বে পর্বতসঙ্কুল নেপাল দেশে একজন ধনবান ও সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তাঁর পূর্বপুরুষেরা নেপালের রাজপুরোহিত ছিলেন। দেশের প্রথা অনুসারে রাজপুরোহিতের প্রথম পুত্রই পিতার পদ পেতেন এবং রাজ্যের মধ্যে এই পদের থেকে উঁচু পদ আর ছিল না। ব্রাহ্মণের চারটি স্ত্রী ছিল। তাঁদের মধ্যে তিনি একজনকে অন্যদের থেকে বেশি ভালোবাসতেন এবং তাঁরই গর্ভে চন্দ্রলীলা জন্মগ্রহণ করেন।

সাত বছর বয়সে (১৮৮২ সাল) এক ব্রাহ্মণ বালকের সাথে চন্দ্রলীলার বিবাহ হয়। এই বিবাহে জাঁকজমক ও ধূমধামের কোনও অভাব হয়নি;কিন্তু দুই বছর পার হতে না হতে একদিন সকালবেলা চন্দ্রলীলার শ্বশুরবাড়ি থেকে দুঃসংবাদ আসল যে, তাঁর স্বামীর মৃত্যু হয়েছে। তাঁর শ্বশুর গোঁড়া ও অহঙ্কারী ছিলেন। পুত্রের মৃত্যুতে তাঁর বংশরক্ষার সকল আশা নষ্ট হল। তাই শ্বশুর বাড়িতে তাঁর আর স্থান হল না। বাল্যকালেই চন্দ্রলীলা বিধবা হলেন এবং বুঝতে পারলেন, বালবিধবা সকলেরই চক্ষু-শূল।

তেরো বছর বয়স পর্যন্ত চন্দ্রলীলা পিতার বাড়িতে ছিলেন। তাঁর পিতা বিচক্ষণ ও পণ্ডিত। তিনি নিজে কন্যাকে লেখাপড়া শেখাতেন। পিতার যত্নে কেবল মাতৃভাষায় নয়, সংস্কৃত ভাষায়ও চন্দ্রলীলার জ্ঞান জন্মাল। পাঠক-পাঠিকারা মনে রাখবেন যে, উত্তর ভারতের প্রায় সমস্ত ভাষাই সংস্কৃত থেকে উৎপন্ন;এইজন্য চন্দ্রলীলার পক্ষে সংস্কৃত শিক্ষা করা কঠিন হয়নি।

এই সময়ে চন্দ্রলীলা অনেক কষ্ট স্বীকার করে পিতার সাথে জগন্নাথ দর্শন

করতে পুরুষোত্তম তীর্থে গেলেন। নেপাল থেকে উড়িষ্যা অনেক দূর এবং হেঁটে যেতে অনেক দিন লাগে। তীর্থস্থানে নানা কারণে, বিশেষত খাদ্য ও পানীয় জলের কারণে অনেকে অসুস্থ হতেন, এবং চন্দ্রলীলার পিতাও অকস্মাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং এই অসুখেই তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্বে তিনি চন্দ্রলীলাকে ডেকে বললেন, "মা তোমাকে ফেলে চললাম। এই চাবিগুলি নাও; বাড়ি গিয়ে যে যে সিন্দুক ও বাক্সে এগুলি লাগবে, তা খুলবে এবং ভিতরে যা কিছু পাবে সে সকলই তোমার; তোমার স্বামী তোমার জন্য রেখে গিয়েছে।" কাঁদতে কাঁদতে তিনি পিতার হাত থেকে চাবিগুলি নিলেন এবং চোখের জল ফেলতে ফেলতে তার মৃত্যু দেখতে লাগলেন। মৃত্যুর অল্পকাল পরেই শবদাহ করা হল। এইপ্রকারে চন্দ্রলীলা বিদেশে আশ্রয়হীনা হলেন এবং শোকে ও ভাবনায় কাতর হয়ে পড়লেন। শেষে নেপালের অন্য যাত্রিদের সঙ্গে তিনি স্বদেশে ফিরে আসলেন।

পরের বছর শোকের কিছুটা উপশম হলে তিনি মন দিয়ে শাস্ত্রপাঠ করতে লাগলেন। শাস্ত্র পড়ে তিনি হিন্দু ধর্মের কোনও কোনও বিষয় ভালো করে জানতে পারলেন। তিনি দেখলেন, শাস্ত্রে পবিত্র তীর্থস্থানের মাহাত্ম্য বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, তীর্থ পর্যটনে পুণ্য সঞ্চয় হয়। তিনি আরও জানতে পারলেন যে, বালিকারা যে পাপের ফলে বিধবা হয়, তা খণ্ডন করার উপায় আছে। ভারতবর্ষের চারটি দেবালয়ে "চতুর্ধর্ম" নামক অনুষ্ঠান পালন করলে বালবিধবার পাপমোচন হয়। তিনি এই অনুষ্ঠান পালন ও শাস্ত্রের অনুমোদিত অন্যান্য কার্য করতে সঙ্কল্প করলেন।

একদিন বাড়ির দু'জন বিশ্বস্ত দাসীর কাছে তিনি মনের কথা খুলে বললেন এবং তাঁর সঙ্গে তীর্থে তীর্থে বেড়ালে যে কত পুণ্য সঞ্চয় হবে, তাও তাদের বুঝিয়ে দিলেন। তাতে তারা দু'জনই তাঁর সঙ্গে যেতে রাজি হল। তিনিও যাত্রার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। তাঁর স্বামী যে টাকা-পয়সা রেখে গিয়েছিলেন তার মধ্য থেকে কতকগুলি মোহর নিয়ে একটা গেঁজিয়ার ভিতরে পুরে কোমরে বাঁধলেন

এবং কতকগুলি কাপড় নিয়ে একটা পুঁটলি করলেন। পরে একদিন রাতে, ভাই-বোন ও বিমাতারা ঘুমিয়ে গেলে চাকরাণী দু'জনকে সঙ্গে নিয়ে তিনি তীর্থ পর্যটনে বের হলেন।

পাহাড়ময় উঁচু নিচু পথে ক্রমাগত সাতদিন চলে চন্দ্রলীলা দু'জন দাসীর সাথে সমভূমিতে আসলেন। সেইসময়ে রেলপথ ছিল না, এইজন্য সমস্ত পথ তাঁকে হেঁটে আসতে হল। সমভূমিতে স্থানে স্থানে ভাড়াটিয়া গরুর গাড়ি পাওয়া গেল। যখন হাঁটতে হাঁটতে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়তেন, তখন গরুর গাড়ি ভাড়া করতেন। কিন্তু যেমন গরুর গাড়িতে বসে তেমনই হেঁটে যাওয়ার সময়ে, হয় তিনি মালা জপ করতেন, না হয় কোনও স্তব গান করতেন।

পথের মধ্যে যে যে পবিত্র নদী সামনে পড়ল, প্রত্যেকটিতেই তিনি স্নান করলেন, যে যে দেবমন্দির দেখতে পেলেন, প্রত্যেকটিতেই দেবতার পূজা দিলেন ও ব্রাহ্মণদের দান করলেন। যে প্রধান চারটি তীর্থ দর্শন করতে তিনি বার হয়েছিলেন, তাদের মধ্যে কালীঘাট একটি। এইজন্য তিনি প্রথমে কলকাতার দিকে যেতে লাগলেন। কালীঘাটে পৌঁছে তিনি আদি গঙ্গায় স্নান করে কালীর পূজা দিলেন। এক বৎসর পূর্বে তিনি পিতার সাথে এই পথে এসেছিলেন। সেবারের মতো এবারেও পথে অনেক সহযাত্রি মিলল। এবারেও তিনি অনেক যাত্রিকে ক্ষুধা ও পীড়ায় কষ্ট পেতে এবং অনেককে পথের ধার পড়ে থাকতে দেখলেন। কারও কারও প্রাণনাশও হল। বিদেশে আত্মীয়-স্বজনের থেকে দূরে এবং নিরাশায় তারা চলে গেল দেখে চন্দ্রলীলা কখনও ভয় পেতেন, কখনও নিরাশ হতেন; তথাপি আবার মন শক্ত করে পূর্বের সঙ্কল্প অনুযায়ী কাজ করতে আরম্ভ করতেন। কালীঘাটের পূজা শেষ হলে তিনি উড়িষ্যার দিকে রওনা দিলেন। এবার পথ চলতে তাঁর আরও বেশি কষ্ট হল, অবশেষে অতি ক্লান্ত শরীরে ভারত বিখ্যাত জগন্নাথ মন্দিরের অনতিদূরে উপস্থিত হলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়
জগন্নাথের মন্দিরে

বঙ্গদেশের দক্ষিণে উড়িষ্যা দেশ। এই উড়িষ্যার পুরী নগরে জগন্নাথের মন্দির রয়েছে। জগন্নাথের মূর্তি দেখতে একেবারেই সুন্দর নয়। মূর্তির মাথা কতকটা চৌকো, চোখ ও মুখ খুব বড়ো এবং হাত দু'খানির অর্ধেক নেই। জগন্নাথের মূর্তি কেন এইপ্রকার অপূর্ণ হয়েছে, সেই সম্বন্ধে একটি প্রচলিত গল্প আছে:

এক সময়ে উড়িষ্যার উপকূলে ভয়ানক জঙ্গল ছিল। এই জঙ্গলের মধ্যে বহু বন্য পশু বাস করত। জঙ্গলের মাঝখানে একটি দেবমন্দির ছিল। লোকে এই মন্দিরকে এত ভয় করত যে, কেউ সাহস করে কাছে যেত না। মন্দিরের বিষয়ে নানা ভয়ঙ্কর গল্প লোকদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। একজন পরাক্রমী রাজা এইসকল শুনে ঐ মন্দিরের দেবতাকে দেখতে চাইলেন এবং যাতায়াতের পথ তৈরি করবার জন্য একজন কর্মচারীকে পাঠিয়ে দিলেন। সেই কর্মচারী গিয়ে দেখলেন, সেখানে মন্দির নেই, জঙ্গলও নেই, কেবল বালির মাঠ পড়ে আছে। এই সংবাদ শুনে রাজা অত্যন্ত দুঃখিত হলেন এবং মনে মনে ভাবলেন দেবদর্শনের ইচ্ছা করে ভালো কাজ করেননি, কারণ হতে পারে তাঁর দোষে দেবতার অন্তর্ধান হয়েছে। দেবতার ক্রোধ উপশম করার জন্য রাজা অতি ভক্তিভাবে দেবতার পূজা দিতে লাগলেন। রাজার ভক্তি দেখে দেবতা তুষ্ট হলেন এবং স্বপ্নে রাজাকে আগের মন্দিরের স্থানে একটি মন্দির তৈরি করতে আদেশ করলেন, আরও বলে দিলেন যে, বিশ্বকর্মা স্বয়ং এসে যে প্রতিমা অদৃশ্য হয়েছে, তার একটি নতুন মূর্তি তৈরি করে দেবেন।

এই কথা অনুযায়ী বিশ্বকর্মা মূর্তি তৈরি করতে আসলেন। আর আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কৃষ্ণ যে নিম গাছের তলায় বাণবিদ্ধ হয়ে মরেছিলেন সেই গাছের

গুঁড়িটা ভাসতে ভাসতে তাঁর কাছে আসল। বিশ্বকর্মা তৈরি করতে আরম্ভ করলেন এবং সকলকে বলে দিলেন কাজ শেষ হওয়ার পূর্বে যদি কেউ তাঁকে বিরক্ত করে, বা তাঁর দিকে উঁকি মেরে দেখে, তবে তিনি তখনই চলে যাবেন, আর মূর্তি তৈরি করবেন না! এক পক্ষ অতীত হল। রাজা আর ধৈর্য ধরতে না পেরে দেখতে গেলেন। ততে বিশ্বকর্মা কাজ ফেলে চলে গেলেন, আর ফিরে এলেন না। কাজেই প্রতিমার অনেক অঙ্গ অসম্পূর্ণ থেকে গেল এবং কোনও কোনও অঙ্গ একেবারেই তৈরি হল না। রাজার মনে বড়ো দুঃখ হল। তিনি বহু যত্নে কৃষ্ণের অস্থি জোগাড় করে ঐ মূর্তির ভিতর রেখে দিলেন এবং ঐ অসম্পূর্ণ প্রতিমার পূজা প্রচলন করলেন। দেখতে সুন্দর না হলেও পুরীর জগন্নাথ ভারতের মধ্যে বিখ্যাত বিগ্রহ।

পুরীর মন্দিরটি দেখতে চমৎকার। লোকে বিশ্বাস করে মন্দিরের চারদিকে চল্লিশ ক্রোশ পর্যন্ত ভূমি পবিত্র এবং এই পবিত্র ভূমিতে দেবতারা বাস করেন। রথের সময়ে ভারতের নানা স্থান থেকে অনেক যাত্রি পুরীতে যায়। পূর্বে যখন রেলপথ ছিল না, তখন পুরীতে হেঁটে যেতে যাত্রিদের যারপরনাই কষ্ট ভোগ করতে হত। এখন রেলপথ হওয়াতে যাত্রিদের পথের কষ্ট কমে গেছে।

রথের সময়ে জগন্নাথ, জগন্নাথের ভাই বলরাম ও বোন সুভদ্রার মূর্তি অতি সমারোহের সাথে বার করা হয়। তিনটি মূর্তির তিনখানি রথ আছে। প্রত্যেক মূর্তির গলায় মোটা দড়ি বেঁধে রথে তোলা হয়। জগন্নাথের রথ চল্লিশ হাত উঁচু এবং দেখতে কালীঘাটের মন্দিরের মতো। রথের গায়ে কিন্তু নানা মূর্তি খোদিত আছে। স্ত্রী-পুরুষ ও বালক-বালিকারা সমস্ত দিন ঐ সকল দেখতে থাকে।

রথের সঙ্গে খুব শক্ত মোটা কাছি বেঁধে দেওয়া হয়। শত শত লোক ঐ কাছি ধরে রথগুলি টেনে নিয়ে যায়। টানবার সময়ে সকলে "জয় জগন্নাথ" বলে প্রচণ্ড চিৎকার ও কোলাহল করে। প্রায় সকলেই রথের কাছি ধরার জন্য ব্যস্ত হয়। আমি স্বচক্ষে দেখেছি, প্রাচীন স্ত্রীলোকেরা কাঁপতে কাঁপতে রথের কাছি স্পর্শ করে,অথবা

কাছে গিয়ে প্রণাম করে। বৃষ্টি কাদার মধ্যে অনেক সময় রথ চালাতে খুবই কষ্ট ও দেরি হয়।

যারা রথ টানে তাদের সমস্ত শরীরে কাদা লাগে এবং তারা পাগলের মতো চিৎকার করতে থাকে। অনেকে রথের সামনে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে। কেউ কেউ রথের পাশে কাদায় গড়াগড়ি দেয়। রথ চলতে আরম্ভ করলে লোকেরা যেন উন্মত্ত হয়ে ওঠে। অগণ্য লোকের চিৎকার ও কলরবে স্থান কোলাহলপূর্ণ হয়। পূর্বে লোকেরা রথের চাকার নিচে শিশুদের ফেলে দিত এবং অনেকে রথের চাকার সামনে উবুড় হয়ে পড়ে থাকত, আর তাদের উপর দিয়ে রথের চাকা চলে যেত। এইপ্রকারে প্রাণ দেওয়াকে লোকে খুব পুণ্য কাজ বলে মনে করত। এখনও রথ টানবার সময়ে লোকে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং পুলিশ এসে অনেককে চাকার নিচ থেকে তুলে রক্ষা করে। রথ টানবার সময়ে কখনও কখনও ভয়াবহ কাণ্ড ঘটে।

চন্দ্রলীলা এই বিখ্যাত তীর্থস্থানে দুই সপ্তাহ ধরে জগন্নাথের আরাধনা করলেন। এখানেও তিনি ব্রাহ্মণ ভোজন করালেন ও ব্রাহ্মণকে দুগ্ধবতী গরু দান করলেন। দু'বার তিনি জগন্নাথের ভোগ দিলেন এবং তাতে তাঁর ৫০ টাকা খরচ হল। এখানকার করণীয় সকল কাজ শেষ করে তিনি তাঁর অভিলষিত তৃতীয় তীর্থস্থানের অভিমুখে যাত্রা করলেন। এই তীর্থস্থানটি দক্ষিণ ভারতের এক প্রান্তে। পুরী থেকে এখানে যেতে অনেক দিন লাগে এবং হেঁটে গেলে যাত্রিদের অনেক ক্লেশ ভোগ করতে হয়। এই তীর্থস্থানের নাম রামেশ্বর।

তৃতীয় অধ্যায়
রামেশ্বরের মন্দিরে

ভারতের দক্ষিণে সিংহল (বর্তমান শ্রীলঙ্কা) দ্বীপের কাছে একটি ছোট দ্বীপের উত্তরাংশে একটি ছোট পাহাড়ের উপরে রামেশ্বরের মন্দির। মন্দিরের চারিদিকে প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। প্রাচীরের মধ্যস্থিত প্রাঙ্গন কমবেশি চারশো হাত দীর্ঘ ও একশো আটাত্তর হাত প্রস্থ হবে। এর সিংহদ্বারটি পঁয়ষট্টি হাত উঁচু। মন্দিরের দালান দেখতে অতি সুন্দর এবং ও কমবেশি কুড়ি হাত লম্বা, তেরো হাত চওড়া ও কুড়ি হাত উঁচু। ছাদে ও দরজাতে বড়ো বড়ো এক একখানা পাথর গাঁথা আছে। সম্ভবত এই মন্দির খ্রীষ্টিয় সপ্তদশ শতাব্দীতে নির্মিত হয়ে থাকবে। কথিত আছে হনুমান ও বানর সৈন্যের সাহায্যে রামচন্দ্র যেখানে সেতু বেঁধে ভারতবর্ষ থেকে লঙ্কায় গিয়ে সীতাকে উদ্ধার করেছিলেন, এই মন্দিরটি সেখানেই নির্মিত হয়েছে। রামচন্দ্র নাকি এখানে একটি শালগ্রাম স্থাপন করেছিলেন। এখনও পাণ্ডারা সেই শালগ্রাম ধোয়া জল যাত্রিদের কাছে বিক্রি করে।

রামচন্দ্র সম্বন্ধে রামায়ণে যে বিবরণ পাওয়া যায়, তার সংক্ষিপ্তসার এই: রামচন্দ্রের পিতার নাম রাজা দশরথ। দশরথে তিনটি রাণী ছিল বলে তাঁর সিংহাসনে একাধিক উত্তরাধিকারী ছিল; কিন্তু রামই ছিলেন রাজার প্রিয় পুত্র এবং প্রজারা তাঁকে ভালোবাসত। এইজন্য রাজা রামকেই নিজ পদে অভিষক করতে ইচ্ছা করলেন। এর পূর্বে রাজা দ্বিতীয় রাণী কৈকেয়ীর কাছ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, রাণী যা চাইবেন তিনি তাঁকে তাই দেবেন। কৈকেয়ী যখন জানতে পারলেন যে, রামচন্দ্রকেই সিংহাসন দান করা হবে, তখন তিনি পূর্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়ে রাজাকে বললেন, আমি আপনার কাছে এই বর চাইছি — রামচন্দ্রকে চৌদ্দ বছরের জন্য বনবাসে পাঠিয়ে দিন এবং আমার পুত্র ভরতকে সিংহাসনে অভিষেক করুন।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজাকে নিজ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে হল। নিরপরাধ রাম চৌদ্দ বছরের জন্য আপনার স্ত্রী সীতা ও ভাই লক্ষণের সঙ্গে বনবাসে চলে গেলেন এবং বনে বনে বেড়িয়ে ফলমূল খেয়ে জীবনধারণ করতে লাগলেন।

রামচন্দ্রের স্ত্রী সীতা পরমা সুন্দরী ছিলেন। দেবতারা পর্যন্ত তাঁর রূপলাবণ্যে মোহিত হয়েছিলেন! তাঁকে বনবাসী রামের কাছ থেকে হরণ করতে অনেকে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু কেউই কৃতকার্য হয়নি; কেননা তিনি নিতান্তই পতিগতপ্রাণা ছিলেন এবং সমস্ত মন দিয়ে স্বামীর সেবা করতেন। অবশেষে লঙ্কার রাজা রাবণ তার বোন সুপর্ণখার নাক কাটার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তাঁকে হরণ করার সঙ্কল্প করল। একদিন একটা সুন্দর হরিণ দেখে রাম সেটাকেই লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়লেন, কিন্তু তীর লাগল না। হরিণটি পালিয়ে যেতে আরম্ভ করলে রামও তার পিছনে ছুটলেন এবং ক্রমে অনেক দূরে গিয়ে পড়লেন। পরে লক্ষণও ভাইয়ের খোঁজ করতে গেলেন; কিন্তু যাওয়ার পূর্বে যে কুটিরে তাঁরা থাকতেন, তার চারিদিকে একটি গণ্ডি এঁকে সীতাকে বলে গেলেন, এই গণ্ডির ভিতরে থাকলে কেউ তাঁর কোনও অনিষ্ট করতে পারবে না।

রাম ও লক্ষণ চলে গেলেই রাবণ সন্ন্যাসীর বেশে কুটিরের দ্বারে এসে ভিক্ষা চাইল। লোকে সচরাচর ভিখারিকে ভিক্ষা না দিয়ে বিদায় করে না। এইজন্য সীতা অত্যন্ত চিন্তার মধ্যে পড়লেন। তিনি গণ্ডির বাইরে যেতে চান না অথচ সন্ন্যাসীকেও ভিক্ষা না দিয়ে পারেন না। তিনি ভিক্ষা দেওয়াই উচিত মনে করলেন। পরে ভিক্ষা দেওয়ার জন্য যেমন গণ্ডির বাইরে আসলেন, অমনি রাবণ নিজ মূর্তি ধরে তাঁকে রথে তুলে নিল এবং অবিলম্বে লঙ্কায় গিয়ে তাঁকে অশোক বনে রেখে দিল!

রাম ফিরে এসে দেখলেন, সীতা নেই, কেবল শূণ্য কুটির পড়ে রয়েছে। সীতার শোকে তিনি অত্যন্ত কাতর হয়ে বিলাপ করতে লাগলেন। রামায়ণে লেখা আছে।

"কাঁদিয়া বিকল রাম জলে ভাসে আঁখি
রামের ক্রন্দনে কাঁদে বন্য পশুপাখি"।।

এই শোকের সময়ে রাম হনুমানের দেখা পেলেন। হনুমান রামকে বলল যে, সে লঙ্কায় গিয়ে সীতার সংবাদ এনে দিতে পারবে। রাম একথা শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং তিনি যে হনুমানকে পাঠিয়েছেন, তার প্রমাণস্বরূপ নিজের আংটি তার হাতে দিয়ে বিদায় করলেন। হনুমান তা নিয়ে লঙ্কার দিকে যাত্রা করল।

হনুমান ভারতের দক্ষিণ কূলে গিয়ে এক লাফে সমুদ্র পার হল। পরে সে লঙ্কার রাজবাড়িতে পৌঁছিয়ে ক্ষুদ্র মর্কট বেশ ধরল এবং দেওয়ালের ছিদ্র দিয়ে সীতার কাছে উপস্থিত হল। সীতার হাতে আংটি দিয়ে তাঁকে রামের সংবাদ জ্ঞাত করল। পরে সীতার প্রেমপূর্ণ বার্তা নিয়ে হনুমান আবার মর্কট বেশে বাইরে এল। শেষে যখন নিজ মূর্তি ধরে সমুদ্র পার হওয়ার উদ্যোগ করছিল, তখন লঙ্কাবাসীরা তাকে চর বলে ধরে ফেলল ও বিচারার্থে তাকে রাজার কাছে নিয়ে গেল। লোকেরা তাকে যারপরনাই অপমান করল, এমনকি তাকে বসার জন্য আসনও দিল না।

হনুমান, রাজার কথার এমন শ্লেষ ও কৌতূকজনক উত্তর দিল যে, রাজদরবারে লোকেরা হেঁসে অস্থির হল। রাজা সকলকে জিজ্ঞাসা করলেন, এইপ্রকার অনধিকারীর কী দণ্ড হওয়া উচিত? একজন বিচক্ষণ মন্ত্রী বললেন, ওর লেজে একটি জ্বলন্ত মশাল বেঁধে ছেড়ে দিলে ভালো হয়। দরবারের সকলে এই প্রস্তাবে সম্মতি দিল। তাতে হনুমানের লেজে জ্বলন্ত মশাল বেঁধে ছেড়ে দেওয়া হল। হনুমান তখন ঐ মশাল নিয়ে ধান ক্ষেতে দৌড়ে গেল, তাতে আগুন লেগে পাকা ধান পুড়ে গেল। পরে লোকের ঘরের চালে চালে লাফিয়ে বেড়াতে লাগল, তাতে আগুন লেগে সব খড়ের ঘর পুড়ে গেল। আগুন খুব জ্বলে উঠলে সে দুই হাতে চটকিয়ে মশালের আগুন নিভিয়ে ফেলল। পরে আনমনাভাবে দুই হাত

তার মুখে বুলাল এবং অমনি তার মুখ কালো হয়ে গেল। সেই থেকে ধূসরবর্ণ, কৃষ্ণমুখ ও লম্বা লেজবিশিষ্ট বানরদের দেখলে অনেকে "হনুমানজি" বলে তাদের পূজা করে থাকে।

হনুমান সীতার সংবাদ নিয়ে ফিরে আসলে বানরসৈন্য সংগৃহীত হল এবং রামচন্দ্র সেই সৈন্য নিয়ে সীতাকে উদ্ধার করতে লঙ্কার দিকে রওনা হলেন। সমুদ্রের কূলে উপস্থিত হলে বানরেরা পাহাড় উপড়িয়ে এনে সমুদ্র বেঁধে ফেলল এবং রামচন্দ্র সেই বাঁধের উপর দিয়ে সৈন্য নিয়ে লঙ্কায় উপস্থিত হলেন। রাবণের সঙ্গে রামের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হল। কিছুকাল যুদ্ধের পরে রাম জয়ী হলেন এবং সীতাকে নিয়ে ঘরে ফিরে আসলেন।

হিন্দুরা এখনও এই বিবরণ আক্ষরিকভাবে সত্য বলে বিশ্বাস করে এবং এই সেতুবন্ধ রামেশ্বরের মন্দিরে রামনাথ দর্শন করতে যায়।

চন্দ্রলীলা কয়েক মাস হেঁটে সেতুবন্ধে উপস্থিত হলেন। দশদিন সেখানে থেকে রামের পূজা করলেন এবং ব্রাহ্মণদের ভোজ দিলেন। এছাড়া তিনি রামনাথকে একটি দুগ্ধবতী গরু দান করলেন। রামের একটি ছোট মূর্তি কিনে তিনি অতি যত্নের সাথে পুঁটলির মধ্যে রেখে দিলেন। হাতে জপের মালা নিয়ে জপ করতে করতে তিনি এখান থেকে প্রস্থান করলেন এবং পথের মধ্যে ঐ মূর্তির আরাধনা করতে থাকলেন।

চতুর্থ অধ্যায়
পথের দুঃখ-কষ্ট

এবার চন্দ্রলীলা দ্বারকনাথ তীর্থে যেতে ইচ্ছা করলেন। যদিও এই সময়ে পথ চলা অত্যন্ত কষ্টকর ছিল এবং হেঁটে যাওয়া ছাড়া অন্য কোনও উপায় ছিল না, তথাপি তিনি কোনও বাধাই মানলেন না; কোনও কিছুই তাঁকে সঙ্কল্পচ্যুত করতে পারল না। ক্রমাগত কয়েক মাস হেঁটে তিনি বিখ্যাত তীর্থ দ্বারকানাথে উপস্থিত হলেন। এই তীর্থস্থানটি ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিমে কাথিবার উপদ্বীপের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত। পুরাণে কথিত আছে যে, স্বয়ং কৃষ্ণ এই দ্বারকানাথের স্থাপনকর্তা। নগরের চারিদিকে উঁচু গড় এবং নগরের ভিতরে অনেক সুন্দর বাগান ও পুকুর আছে। শ্রীকৃষ্ণ নাকি এখানে অনেক লীলাখেলা করেছিলেন। অনেকে মনে করে যে, কোনও দৈবশক্তির বলে এক রাতের মধ্যেই এই মন্দিরটি তৈরি হয়েছিল। প্রধান মন্দিরটি ছাড়া এখানে একটি বড়ো নাটমন্দির আছে। এর ছাদ ষাটটি লাল বালি-পাথরের থামের উপরে স্থাপিত; আর চূড়া একশো হাত উঁচু। প্রধান মন্দিরটি পাঁচতলা এবং তেষট্টি হাত উঁচু। কথিত আছে যেদিন শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যু হয়, সেইদিন সমুদ্রের জল অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়ে সমস্ত নগর ডুবিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু মন্দিরটি ডুবাতে পারেনি। এই মন্দির সম্বন্ধে কিংবদন্তী এই যে, "শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি এই তীর্থে যে কেউ আসে, সে সমস্ত পাপ থেকে মুক্তি পায়।" এইজন্য লক্ষ লক্ষ লোক এই তীর্থ দর্শন করতে যায়।

চন্দ্রলীলা এখানে এসে সর্বাঙ্গে চন্দন মাখলেন এবং এক পক্ষকাল থেকে মন্দিরের বিগ্রহকে ভোগ দিলেন। এইসময়ে তিনি ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসীদেরও ভোজ

দিলেন। পরে এখান থেকে বিখ্যাত তীর্থ বদ্রীনাথ অভিমুখে যাত্রা করলেন।

এই বদ্রীনাথ একটি বিশেষ তীর্থস্থান। এর অবস্থান ভারতের উত্তর সীমায়। এখানে বিষ্ণুর মন্দির রয়েছে,এবং হিন্দু শাস্ত্র অনুযায়ী বিষ্ণুই রক্ষা ও পালনকর্তা। কথিত আছে এই মন্দিরের বিগ্রহটি গঙ্গার প্রধান শাখা অলকানন্দার গর্ভ থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল। এখানকার মন্দিরটি চতুষ্কোণ, উপরে তামার গম্বুজ এবং তার উপরে সোনার গোলক। হিমালয় পর্বতের বরফে ঢাকা একটি শৃঙ্গে এই মন্দিরটি তৈরি করা হয়েছে। এই শৃঙ্গটি সমুদ্র থেকে সাত হাজার হাত উঁচু। বদ্রীনাথের পাশে যে পাহাড় আছে তার নাম কেদারনাথ। এই দুটি পাহাড়ই দেখতে অতি সুন্দর। নৈনিতাল থেকে মুসৌরি যাওয়ার সময়ে এই পাহাড় দুটির সৌন্দর্যে পথিকের মন মুগ্ধ হয়। যে বরফরাশি দেখে চোখ জুড়ায় তার মধ্যে পড়ে কত শান্তি-অন্বেষী যে কত কষ্টভোগ করে প্রাণ হারিয়েছে, তা যদি এই পাহাড় দুটি বলতে পারত, তাহলে অনেকের শিক্ষালাভ হত।

যদিও চন্দ্রলীলা ক্লান্ত ও দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন তথাপি আশায় বুক বেঁধে হাঁটতে হাঁটতে বদ্রীনাথের পাহাড়ের নিচে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর দু'জন সঙ্গীনির সাথে তিনি পাহাড়ে উঠতে আরম্ভ করলেন। অল্পদূর উঠতে না উঠতেই তাঁর খালি পা ঠাণ্ডায় অসাড় হয়ে এল। বরফে পা ফেটে রক্ত পড়তে লাগল। সঙ্গে যে কাপড় ছিল, তিনি তা পুঁটলি থেকে বার করলেন এবং পায়ে চড়িয়ে আবার চলতে লাগলেন। যত উপরে উঠলেন, বাতাস তত বেশি ঠাণ্ডা বোধ হতে লাগল; তথাপি কোনও বাধা না মেনে তিনি উঠতে লাগলেন। ক্রমে বরফে ঢাকা পাহাড় ও বড়ো বড়ো বরফের চাপের উপর দিয়ে অতি কষ্টে চলতে চলতে একপ্রকার আধমরা অবস্থায় পবিত্র তীর্থস্থানে পৌঁছালেন। মন্দিরে পাঁচদিন 'হত্যা' দেওয়ার পরে চন্দ্রলীলা ভাবলেন, বোধহয় দেবতারা এর থেকে আর বেশি কষ্টভোগ চান না। এখানকার কাজ শেষ করে তিনি আবার নিচে নামতে আরম্ভ করলেন; কিন্তু তাঁর মনের বোঝা নামল না। চারটি প্রধান তীর্থস্থান দর্শন করতে পেরেছেন বলে তিনি নিজেকে অনেকটা কৃতার্থ মনে করলেন বটে, কিন্তু তাঁর মনের নিরাশা তাঁর পক্ষে সবচেয়ে কষ্টকর হল। আজ সাত বছর তিনি শান্তির অন্বেষণে বের হয়েছেন, কিন্তু এখনও তার খোঁজ পেলেন না। পাছে কোনও ত্রুটি থেকে যায়, এইজন্য তিনি কেদারনাথও দর্শন করলেন এবং যে গঙ্গাজল নিয়ে এসেছিলেন, তা সেখানকার বিগ্রহের মাথায় ঢেলে দিলেন।

এখান থেকে নেমে যত শীঘ্র পারলেন, তিনি হেঁটে বিখ্যাত হরিদ্বারে আসলেন। এখানে পাহাড়ের পাশ দিয়ে গঙ্গা বয়ে গিয়েছে। পুরাণে লিখিত আছে, গঙ্গা প্রথমে স্বর্গে ছিল, কিন্তু ভগীরথের তপস্যার শক্তিতে তাঁকে মর্ত্যে আসতে হয়েছে। স্বর্গ ছেড়ে আসতে গঙ্গার খুব রাগ হয়েছিল। ক্রুদ্ধ গঙ্গা হঠাৎ পৃথিবীতে পড়লে পৃথিবী পাছে নষ্ট হয়, এইজন্য মহাদেব পর্বতের উপর দাঁড়িয়ে গঙ্গাকে নিজ জটায় ধারণ করলেন। কিছুকাল জটায় রাখার পর গঙ্গার কেবল একটি মাত্র ফোঁটা পৃথিবীতে পড়তে দেওয়া হয়েছিল, আর তা থেকেই জগদ্বিখ্যাত গঙ্গা নদীর উৎপত্তি হয়েছে। হাজার হাজার ভারতবাসী তাদের পাপ ধোওয়ার জন্য এই গঙ্গায় স্নান করে। হরিদ্বারের ঘাট ও তার নিকটস্থ মন্দির যে দেখতে খুব সুন্দর, তাতে সন্দেহ নেই। ঘাটের উপরে এক স্থানে বিষ্ণুর পদচিহ্ন পাথরে কেটে দেওয়া হয়েছে। লোক খুব ভক্তির সাথে এই পদচিহ্নকে প্রণাম করে। পূর্বে এই পদচিহ্ন দেখতে গিয়ে ও ঠিক নির্দিষ্ট মুহূর্তে স্নান করবার জন্য ঘাটে নামার সময়ে অনেকে চাপাচাপিতে মারা পড়ত। এখন পুলিশ উপস্থিত থেকে এইপ্রকার দুর্ঘটনা থেকে যাত্রিদের রক্ষা করে। লোকে বিশ্বাস করে বৈশাখ মাসের প্রথম দিনে গঙ্গা পৃথিবীতে এসেছিলেন। এইজন্য ঐ তারিখে হরিদ্বারে বহু লোকের আগমন হয়ে থাকে। এইসময়ে অন্য যাত্রিদের সঙ্গে চন্দ্রলীলাও এখানে স্নান করলেন। তিনি এখানেও দেখলেন, তাঁর মতো মুক্তি অন্বেষীরা অকথ্য কষ্টভোগ করছে, অথচ কেউই তৃপ্ত হচ্ছে না। এই দেখে সাহস ও উদ্যোগ সত্ত্বেও চন্দ্রলীলার মন কতকটা নিরাশায় পূর্ণ হল।

এখান থেকে তিনি কাশ্মীরে গেলেন। কাশ্মীরের মন্দিরেও তিনি দেবতার পূজা দিলেন ও ব্রাহ্মণ ভোজন করালেন। পরে তিনি কাশ্মীর থেকে মথুরায় আসলেন এবং পুরাণে লিখিত বিভিন্ন পুণ্য স্থান, এমনকি যেখানে শ্রীকৃষ্ণ গোবর্ধন গিরি ধারণ করেছিলেন, তাও দেখলেন, কিন্তু কোনও স্থানেই এমন কিছু দেখতে বা শুনতে পেলেন না যাতে তাঁর আত্মা তৃপ্ত হতে পারে। মথুরা থেকে তিনি প্রয়াগে এলেন এবং গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর এই মিলনস্থলে স্নান করলেন। মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে চন্দ্রলীলা প্রতিদিন স্নান ও দানধ্যান করলেন। এখানে মাটির নিচে একটি মন্দির আছে। তিনি এই অন্ধকার মন্দিরে গিয়ে পূজা করলেন এবং মন্দিরের অক্ষয় বটের পাতা নিয়ে আসলেন। লোকে বিশ্বাস করে যে, এই পাতায় নানা রোগ ভালো হয়। লোকে মনে করে যে, এই বটগাছটি মাটির নিচেই জন্মে বেঁচে রয়েছে; কিন্তু এ অসম্ভব নয় যে পাণ্ডারা সুযোগ মতো যাত্রিদের অজ্ঞাতসারে বটের ডাল এনে পুঁতে রাখে, আর পাণ্ডাদের কথানুযায়ী লোকে মনে করে, ঐ বটগাছ মন্দিরেই জন্মেছে।

চন্দ্রলীলা এখানে থেকে প্রতিদিন পুরাণাদি শাস্ত্রপাঠ ও শাস্ত্রানুযায়ী নানা অনুষ্ঠান পালন করলেন। পরে তিনি এখান থেকে হিন্দুর পরম পবিত্র স্থান বারাণসী নগরে এলেন। এখানে তিনি সংহারকর্তা বিশ্বনাথের মাথায় গঙ্গা জল ও বিল্ব পত্র দিলেন এবং প্রধান প্রধান পাণ্ডাকে ছাতা, চাদর, থালা, ঘটি, পিলসুজ, কোষাকুষি, চন্দন কাঠ ও গরু দান করলেন। তিনি গঙ্গাতেও ফুল ভাসিয়ে দিলেন। গঙ্গার বক্ষ উজ্জ্বল হয়ে ভাসমান উদ্যানের মতো হল, কিন্তু চন্দ্রলীলার মনের আঁধার ঘুচল না। বারাণসীর নানা মন্দিরে গিয়ে তিনি দেবতার আরাধনা করলেন।

এর পরে চন্দ্রলীলা রামের জন্মস্থান অযোধ্যায় গেলেন। এখানেও এক মাস থেকে আপনার প্রিয় দেবতা রামের পূজা করলেন। এখানকার পাণ্ডারা তাঁকে কয়েকটা হাঁড়ি দেখাল; সীতা নাকি ঐগুলিতে রাঁধতেন। এই সময়ে অযোধ্যার

কোনও এক নিকটবর্তী স্থানে থাকার সময়ে তাঁর এক দাসীর কলেরা হল। নিজ জ্ঞান ও ক্ষমতানুযায়ী তিনি তার প্রাণ বাঁচাতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাতে কোনও ফল দেখা গেল না। দাসীটি মারা গেল। পরে পুলিশ এসে ঐ মৃতদেহটি ও সমস্ত কাপড় নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে দিল। এর কিছুদিন পরে ঐরূপে তাঁর অন্য দাসীটিরও মৃত্যু হল। এইবার চন্দ্রলীলা একেবারে সঙ্গীহীনা হলেন। তাঁকে নিজের হাতেই জল তুলতে ও রান্না করে খেতে হল। পূর্বে যা কখনও করেননি, এমন কোনও কোনও কাজ করা তাঁর পক্ষে কষ্টকর হয়ে উঠল।

এই সময়ে চন্দ্রলীলা অত্যন্ত কাতর ও নিরাশ হয়ে পড়লেন এবং কী করা কর্তব্য তাও স্থির করতে পারলেন না। এই সাত বছর তিনি দেশ ও বাড়ি ছেড়ে তীর্থে বেড়াচ্ছেন, অথচ তাঁর প্রাণ যা চায়, তা এখনও তিনি পাননি; কাজেই এখন কী করবেন, তাই তাঁর প্রধান চিন্তার বিষয় হল।

একদিন তিনি বসে চিন্তা করছেন, এমন সময়ে দেখলেন, একদল যাত্রি সেখান দিয়ে যাচ্ছে। তিনি জিজ্ঞাসা করে জানলেন যে, তারা শ্রীক্ষেত্রে যাবে। তাতে তিনি বললেন, "আমিও তোমাদের সঙ্গে শ্রীক্ষেত্রে যাব, কারণ আমার সঙ্গে আর কেউ নেই।" তারা তাঁকে বলল "একটা ভয়ঙ্কর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পথ, আর এই জঙ্গল পার হতে অনেক কষ্ট হবে।" এই কথা শুনে চন্দ্রলীলা এই যাত্রিদের সঙ্গে গেলেন এবং পথের নানা বিপদ ও কষ্ট সহ্য করলেন। তিনি যে টাকা সঙ্গে করে এনেছিলেন তা ফুরিয়ে আসল; কারণ এই টাকা থেকেই তিনি ভিন্ন ভিন্ন তীর্থে অনেক দান করেছিলেন এবং সাত বছর পর্যন্ত তিনজন লোকের খোরাক ও পোষাক চালিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে যথেষ্ট টাকা না থাকলেও তাঁর স্বাধীন ভাব কমল না। নিজের কিছু না থাকলেও তিনি অন্যের দান গ্রহণ করতেন না; এমনকি যাত্রিরা কিছু দিলেও তিনি তা খেতেন না।

পঞ্চম অধ্যায়
সন্ন্যাসীনি চন্দ্রলীলা

যাত্রিদের সঙ্গে একদিন তিনি মেদিনীপুর থেকে দশ ক্রোশ দূরে এক রাজবাড়িতে উপস্থিত হলেন। এখানে রাজা যাত্রিদের জন্য একটি অতিথিশালা তৈরি করে দিয়েছিলেন। এই অতিথিশালাতে যাত্রিদের জন্য প্রতিদিনই রাজবাড়ি থেকে সিধা অর্থাৎ চাল, ডাল, ঘি ইত্যাদি আসত। একদিন চন্দ্রলীলা বসে শাস্ত্রপাঠ করছেন, এমন সময়ে রাজবাড়ির ভৃত্যেরা সিধা নিয়ে আসল। তিনি এর কিছুই না নিয়ে বললেন, "আমি নিজ খরচে খাই, অন্যের কিছু খাই না।" এই কথা শুনে তারা আশ্চর্য জ্ঞান করল এবং রাজার কাছে গিয়ে সংবাদ দিল যে সকলেই চাল, ডাল নিয়েছে কিন্তু কেবল একটি স্ত্রীলোক নেয়নি; সে বসে শাস্ত্রপাঠ করছে। রাজা এই কথা শুনে চন্দ্রলীলাকে ডেকে পাঠালেন। রাজার ভৃত্যদের সঙ্গে তিনি অন্তঃপুরে রাণী ও তাঁর সখীদের কাছে গেলেন। স্ত্রীলোকেরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, "আপনি কোথা থেকে এসেছেন। আমরা যে চাল পাঠিয়েছিলাম, তা নেননি কেন? চন্দ্রলীলা উত্তর করলেন, "আমার বাড়ি নেপাল। আমার পিতা রাজপুরোহিত ছিলেন। আমার নিজের খরচপত্র আমি নিজেই চালাই। আমার নিজের খাবার জিনিস আমি নিজেই কিনে নিই।"

"এত দূরে এসেছেন কেন?"

"ঈশ্বরকে পেতে ও পাপ থেকে মুক্তির সন্ধানে।"

পরে তিনি রাজা ও রাণীর কাছে নিজের জীবনকাহিনী বর্ণনা করলেন। তীর্থে তীর্থে বেড়িয়ে এই কয়েক বছর তিনি যে ক্লেশ ভোগ করেছেন, তা শুনে তাঁরা দুঃখিত হলেন, তাঁদের সমস্ত কথার উত্তরে তিনি বললেন, "কেবল মুক্তি পাওয়ার

জন্য এই কষ্ট সহ্য করেছি।" তখন রাজা বললেন, "আমাদের পুরোহিতের মেয়ের মতো তুমিও আমাদের মা। তুমি আমাদের বাড়িতে থাক, আর তীর্থে তীর্থে বেড়াতে যেও না। আমাদের বাড়িতে পুরোহিত ঠাকুরাণী হয়ে থাক।"

চন্দ্রলীলা রাজবাড়িতেই থাকলেন। রাজা তাঁর জন্য পৃথক একটি কুঠরি ঠিক করে দিলেন। তিনি এখন রাজপরিবারভুক্ত হলেন এবং রাজবাড়ির স্ত্রীলোকদের লেখাপড়া শিখাতে লাগলেন। তিনি যেমন তাদের কাছে পুরাণ থেকে শাস্ত্রপাঠ করতেন, তেমন তাদের নানা ব্রতপালন ও পূজা করতে শিক্ষা দিতেন। অথচ তিনি নিজে সুযোগমতো রাজার ভাণ্ডারীর কাছে বাংলা ও উড়িয়া ভাষা শিখতেন। রাজবাড়ির সকলেই তাঁকে ভক্তি ও আদর করত; রাজা ও রাণী সকাল-সন্ধ্যায় তাঁকে প্রণাম করতেন। তিনি এইপ্রকার সম্মানের সাথে সুখে বাস করতে লাগলেন। কিন্তু কয়েক বছর অতীত হলে রাজা ও রাণীর মৃত্যু হল এবং রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজা হলেন। এখন চন্দ্রলীলার বয়স মাত্র সাতাশ বছর। এতদিন তিনি দেবতাদের সন্তুষ্ট করতে অনবরত চেষ্টা করেছেন; কিন্তু তাঁর প্রাণ যে শান্তি চায় তা পায়নি। এইজন্য তিনি মনে মনে সঙ্কল্প করলেন আর একবার এবং এই শেষবার শান্তিলাভের জন্য বিশেষ চেষ্টা করবেন। এই সঙ্কল্প অনুযায়ী তিনি রাজার কাছে বললেন, "আমি দেশে যাব।" রাজা তাঁর কথায় বিশ্বাস করে তাঁকে বিদায় দিলেন এবং যাওয়ার সময় তাঁর হাতে পাঁচশো টাকা দিলেন।

চন্দ্রলীলা কিন্তু দেশে না গিয়ে পুনর্বার তীর্থদর্শনে বার হলেন। এবার তিনি মনে মনে স্থির করলেন যে, দেবতাদের প্রসন্ন করবার জন্য শাস্ত্রে যে যে প্রকার কষ্টভোগের বিধি আছে, তা যত কঠিনই হোক না কেন, তিনি তিন বছর তা পালন করবেন।

এবার তিনি রামগঞ্জে গিয়ে সন্ন্যাসীদের দলভুক্ত হলেন। তিনি শরীরে ভস্ম

মাখলেন এবং মুখে রক্ত ও শ্বেতচন্দন লেপন করে যোগিনী বেশ ধারণ করলেন। মাথায় সুন্দর ও দীর্ঘ চুলে গোবর মেখে বিশ্রি করে মাথার উপরে জটা বাঁধলেন, কোমরে একটা মোটা ধুতি জড়ালেন, গলায় রুদ্রাক্ষের দীর্ঘ মালা পরলেন, পায়ে খড়ম দিলেন ও হাতে একটি চিমটা নিলেন। শুধু হরিণের চামড়াই তাঁর বিছানা ছিল। তিনি এবার অগ্নিসাধনা করতে আরম্ভ করলেন। গ্রীষ্মকালের প্রখর রৌদ্রের সময়েও চারিদিকে অগ্নিকুণ্ড করে ও হরিণের চামড়ায় বসে তিনি সাধনা করতেন। যতক্ষণ কুণ্ডের মধ্যে থাকতেন, তাঁর সর্বাঙ্গ দিয়ে ঘাম পড়ত। দিনের বেলা যেমন এই ভয়ঙ্কর কষ্টভোগ করতেন, তেমনই রাত্রি দশটা থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত এক পায়ে দাঁড়িয়ে দেবতার দর্শন লাভের জন্য বিগ্রহের স্তব করতেন। এইসব করে তিনি যোগিনী বেশে তীর্থভ্রমণ করলেন। তিনি এক এক তীর্থে তিন তিন মাস যাপন করলেন। ধনী ও দরিদ্র সকলেই তাঁকে মাটিতে শুয়ে প্রণাম করত। ধনবানেরা তাঁর খাবার ও অগ্নিকুণ্ডের কাঠ যোগাত;কারণ তারা মনে করত, এই কাজের দ্বারা তাদের পুণ্য লাভ হয়ে থাকে। শীতকালে এক পায়ে না দাঁড়িয়ে পুষ্করিণীতে গলাজলে নামতেন এবং বারোটা থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত জপ করতেন।

এই ক্লেশভোগ সম্বন্ধে চন্দ্রলীলা নিজে বলেছেন, "শেষে এমন মনে হত যে, রাত্রি আর শেষ হত না। কত কষ্ট যে আমাকে সহ্য করতে হত লোকে তা জানত না। আমার মালাতে একশো আটটি রুদ্রাক্ষ ছিল। এক হাতে মালা নিয়ে দেবতার নাম জপ করতাম, আর অন্য হাতের আঙ্গুলের গাঁটে বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে হিসাব করতাম। তাতে এক লক্ষ আট হাজার বার দেবতার নাম করা হত। ভোরবেলায় সূর্যের আলোর দেখার জন্য পূর্ব দিকে তাকাতাম, আর ভাবতাম এই রাত্রি কি শেষ হবে না? ভোরে যখন জল থেকে উঠতাম, তখন দেখতাম হাত আড়ষ্ট হয়ে গেছে। যেখানে বসে সমস্ত দিন দেবতার স্তব করতাম, অতি কষ্টে সাষ্টাঙ্গে গণ্ডি দিতে দিতে সেখানে যেতাম। প্রায়ই দিনের বেলা বসে বসে ঘুমাতাম। এইভাবে ভগবানকে দিনরাত ডাকলাম। কিন্তু উত্তর পেলাম না।"

এই তিন বছর তিনি লবণ,অন্ন বা অনুরূপ কোনও খাদ্য মুখে দেননি। কেবল ফলমূল যা পেতেন, তাই খেতেন। তিনি কখনও কখনও দেবতার কাছে এইপ্রকার প্রার্থনাও করতেন, "যদি তুমি ঈশ্বর হও, তবে আমার কাছে আপনাকে প্রকাশ কর। এই যে ভোগ দিচ্ছি, তা হাত বাড়িয়ে নাও। এমন কিছু আমাকে দেখতে, শুনতে ও অনুভব করতে দাও যাতে আমি জানতে পারি যে, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছ এবং আমার পাপরাশি ক্ষমা করে আমাকে গ্রহণ করেছ।" কিন্তু তিনি কোনও চিহ্ন দেখতেন না, তাঁর মনেও শান্তি আসত না। এইপ্রকার কষ্টভোগের মধ্যে দয়াময় স্বর্গস্থ পিতা নিজ ভ্রান্ত ও নিরুপায় সন্তানকে পরিত্যাগ করেননি; কিন্তু ঘোর অন্ধকারের মধ্য দিয়েও পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছেন। এইজন্য চন্দ্রলীলা যাঁর অন্বেষণ করছিলেন তাঁকে অবশেষে পেয়েছিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়
প্রতারণা প্রকাশিত

চন্দ্রলীলা এর পরে মূর্শিদাবাদে আসেন। এখানেও তিনি চারিদিকে চারটি অগ্নিকুণ্ড জ্বেলে এবং সামনে একটি বিগ্রহ রেখে তাঁরই পূজা করতেন। তাঁর নিকট দিয়ে যাতায়াত করবার সময়ে অনেকে তাঁকে প্রণাম করত। কেউ কেউ তাঁর পদধূলিও গ্রহণ করত। একদিন আসামের এক রাণী এসে তাঁকে প্রণাম করলেন। চন্দ্রলীলা শুনতে পেলেন যে, রাণীর সঙ্গীদের কেউ কেউ আসামে ফিরে যাবে। আসামের তীর্থস্থানগুলির বিষয়ে তিনি শাস্ত্রে পড়েছিলেন। এইজন্য আসামে যেতে তাঁর ইচ্ছা হল; এবং তিনি রাণীর ভৃত্যদের সঙ্গে যেতে চাইলেন! রাণী সম্মতি দিলেন এবং নিজ পুত্রের কাছে একখানি পত্র লিখে, চন্দ্রলীলাকে যত্ন করতে ও তীর্থদর্শনে তাঁর সাহায্য করতে অনুরোধ করলেন।

আসামে যেতে যেতে অনেকদিন তাঁকে নৌকায় থাকতে হল। নৌকার মধ্যেও তিনি আপনার ব্রত ভঙ্গ হতে দেননি। নৌকায় বসে তিনি মালসায় আগুন জ্বালতেন এবং মালসাগুলি চারদিকে রেখে জপ করতেন। আসামে উপস্থিত হলে রাজপুত্র তাঁকে সম্মানের সাথে অভ্যর্থনা করলেন। রাজবাড়িতে দুই সপ্তাহ থাকবার পরে রাজপুত্র তাঁকে দেশের তীর্থস্থানগুলি দেখবার জন্য পাঠিয়ে দিলেন; এবং তাঁকে সাহায্য করতে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের রাজকর্মচারীদের পত্র লিখলেন।

চন্দ্রলীলা ব্রহ্মপুত্র নদীতে স্নান করলেন। কামরূপের পাণ্ডারা তাঁকে জানাল যে, বছরের এক নির্দিষ্ট দিনে পীঠস্থান থেকে রক্ত বের হয়। সেই রক্তে কাপড় ভিজিয়ে রাখা হয় এবং যে কেউ সেইদিন এখানে থেকে ঐ রক্তমাখা কাপড়ের টুকরো ধারণ করে, তার সকল কামনা সিদ্ধ হয়। চন্দ্রলীলা ঐ নির্দিষ্ট দিন পর্যন্ত কামরূপে থাকতে মনস্থ করলেন। এই ব্যাপার স্বচক্ষে দেখবার এবং এই মহোপকারী বস্তু পাওয়ার জন্য তাঁকে ছয় মাস অপেক্ষা করতে হল। এখানে থেকেও তিনি পূর্বের ন্যায় শারীরিক কষ্টভোগ করলেন, ব্রাহ্মণ কুমারীদের ভোজন করালেন ও দেবতার পূজা দিলেন। রক্ত বের হওয়ার দিন প্রত্যূষে তিনি মন্দিরে গেলেন এবং দেবতার পূজা শেষ করে ঐ ঘটনা দেখবার অপেক্ষায় রইলেন। পাণ্ডারা তাঁকে বিদায় করার জন্য বলল, "এত ভোরে কি আসতে হয়?" এখন যাও, যখন সকলকে ডাকব তখন এস।" তিনি সেখান থেকে চলে গেলেন বটে, কিন্তু সকলকে ডাকবার আগেই ফিরে এলেন। তিনি দেখলেন, তখনও রক্ত বের হয়নি। একজন পাণ্ডা একটা ছাগল কেটে তার রক্তে কাপড় ভিজাল। পাণ্ডাদের মিথ্যা কথায় বিশ্বা করে শত শত লোক ঐ রক্ত মাখা কাপড়ের টুকরো টাকা দিয়ে কিনে নিল, কিন্তু চন্দ্রলীলা কিনলেন না। এই প্রতারণা দেখে তাঁর মনে ভারি অভক্তি হল। সেইদিন থেকে তিনি পাণ্ডাদের অন্যান্য প্রতারণাও ধরতে চেষ্টা করলেন। পাণ্ডারা তাঁকে আরও বলেছিল, "যদি আমাদের কন্যাদের কিছু দেবার প্রতিজ্ঞা করে না দিয়ে চলে যাও, তাহলে পথে জঙ্গল থেকে বাঘ এসে তোমাকে খেয়ে ফেলবে।" তিনি মনে মনে স্থির করলেন, পাণ্ডাদের এই কথা সত্য হয় কিনা, তা দেখবেন। তিনি নিজেই বলেছিলেন, "পাণ্ডাদের এই কথা সত্য কি মিথ্যা তা প্রমাণ করবার জন্য একটা মিথ্যা কথা বললাম। দুটি ব্রাহ্মণ কন্যাকে ডেকে বললাম, "তোমাদের এক একখানা নতুন কাপড় ও ছয়গাছি সোনার চুড়ি দেব। কিন্তু তাদের ঐসব না দিয়েই চলে আসলাম। আমি মনে ভাবলাম, বাঘে খাবে, খাক; যেমন করে হোক মরণ হলেই হল। মন্দির থেকে বের হয়ে যে নির্জন পথ জঙ্গলের মধ্য দিয়ে গিয়েছে, সেই পথে চললাম। আর যেতে যেতে সচকিত হয়ে এদিক-ওদিক দেখতে লাগলাম, সত্যই বাঘ এসে ধরে কি না। বাতাসে গাছের পাতা নড়লে আমার শরীর শিউরে উঠত। তবুও সেই পথে চলতে লাগলাম, কিন্তু একটা বাঘও এল না; তখন আমার মনে হল, ঐ পাণ্ডারা সাধু নয়, কিন্তু প্রতারক।"

এখান থেকে চন্দ্রলীলা অন্য রাজার এলাকায় আর এক তীর্থে গেলেন। এখানে দেখলেন, যারা দামি ও বেশি উপহার দিল, কেবল তাদেরকেই দেবতার দর্শন করতে দেওয়া হল। চন্দ্রলীলা রাজাকে খানিকটা লবণ, আফিং উপহার দিলেন। সেই দেশে এই দুটি দ্রব্য অতি উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান উপহার বলে গণ্য। এখানে সেইসময়ে লবণ অতি দুর্লভ ছিল, এমনকি সকলের ভাগ্যে জুটত না। এখানকার দেবতা পরশুরাম। এখানেই পরশুরাম নাকি পিতার আদেশে মাতৃহত্যা করেছিলেন। যে পাথরের উপরে রেখে কুঠারাঘাতে মায়ের মাথা কেটেছিলেন, লোকেরা সেই পাথরখানা চন্দ্রলীলাকে দেখাল। তিনি তার উপরে ফুল ছড়িয়ে প্রণাম করলেন। এখানেও লোভী পাণ্ডাদের আচরণ দেখে তাঁর অভক্তি আরও বৃদ্ধি পেল। যদিও তিনি তাদের প্রচুর উপহার দিয়েছিলেন, তবুও যাওয়ার সময়ে তারা তাঁর পরিধেয় কাপড়খানার অর্ধেক কেটে রাখল। এইপ্রকার লোকদের হাতে যে তাঁর প্রাণ যায়নি, তাতেই তিনি আনন্দিত হলেন।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে চন্দ্রলীলা শিবের ভার্যা সতীর মৃত্যুর বিষয় পড়েছিলেন। দক্ষ রাজা এক বৃহৎ যজ্ঞে সকল দেবতাকেই নিমন্ত্রণ করেছিলেন, কেবল শিবকে করেননি। শিবের অমতে সতী পিতার যজ্ঞে গেলেন। যজ্ঞের সময়ে দক্ষের মুখে শিবের নিন্দা শুনে সতীর এত মনোদুঃখ হল যে, তিনি মারা গেলেন। নন্দীর মুখে সংবাদ শুনে শিব সদলবলে এলেন এবং দক্ষের যজ্ঞ নষ্ট করে, সতীর দেহ কাঁধে করে নিয়ে পাগলের মতো ঘুরে বেড়াতে লাগলেন, শিবের এই কাণ্ড দেখে নারায়ণ সুদর্শন চক্র দিয়ে সতীর দেহ খণ্ড খণ্ড করে কেটে ফেললেন। যে যে স্থানে সতীর দেহের খণ্ড পড়েছিল, সেই সেই স্থানই তীর্থ বলে গণ্য হয়েছে। কথিত আছে এখানে সতীর একটি চোখ পড়েছিল! চোখটি নাকি একটা কুণ্ডের মধ্যে পড়ে জ্বলন্ত বাতির মতো হয়ে রয়েছে। এই আশ্চর্য ব্যাপার স্বচক্ষে দেখবার জন্য চন্দ্রলীলা ব্যগ্র হলেন এবং অনেক পথ হেঁটে ব্রহ্মকুণ্ডে পৌঁছালেন। পাণ্ডা তাঁকে কুণ্ডটি দেখাল। তিনি দেখলেন কুণ্ডের মধ্যে জলের উপরে সত্য সত্যই একটা আলোর

মতো কী যেন জ্বলছে। পাণ্ডারা তাঁকে বলল, "এটাই সতীর চোখ।"

চন্দ্রলীলা কুণ্ডের চারদিকে ঘুরেফিরে দেখতে লাগলেন। বারবার তাঁর মনে এই প্রশ্ন জাগল, কেমন করে চোখ জলের উপরে আলোর মতো জ্বলবে? তিনি মনে মনে স্থির করলেন, কোনও এক স্থানে লুকিয়ে থেকে দেখবেন, এই রহস্যের মূলে কী আছে। ক্রমে সন্ধ্যা হল। একটু অন্ধকার হলে তিনি দেখতে পেলেন, একজন পাণ্ডা একখানা ডোঙ্গায় চড়ে আলোর কাছে গেল এবং প্রদীপে তেল ঢেলে এমনভাবে রাখল যেন জলের উপরে জ্বলছে। তাঁর মনে কেবল পাণ্ডাদের উপরেই নয়, কিন্তু শাস্ত্রের উপরেও খানিকটা অভক্তি জন্মাল। তবুও তিনি শাস্ত্রানুযায়ী ধর্মানুষ্ঠান পালন করতে লাগলেন। গ্রীষ্মের তিন মাস তিনি আসামে রইলেন, এবং পূর্বের ন্যায় দিনের বেলায় রৌদ্রে বসে পঞ্চাগ্নির তাপ নিতে লাগলেন।

তিন মাস পরে তাঁর কলকাতা আসার ইচ্ছা হল। একজন ভদ্রলোক খরচ দিয়ে তাঁকে জাহাজে তুলে দিলেন। তাঁর সর্বাঙ্গে ভস্ম মাখা, মলিন বেশ এবং সঙ্গে কতগুলি মালসা ও জ্বালানি কাঠ দেখে ক্যাপ্টেন তাকে জাহাজে নিতে অস্বীকার করলেন। শেষে ক্যাপ্টেন তাঁর কাছে অন্য লোকদের থেকে বেশি ভাড়া চাইলেন। তিনি বেশি ভাড়া দিয়েই জাহাজে উঠলেন। পথে ভয়ানক ঝড় আরম্ভ হল তাতে নদীতে বড়ো বড়ো ঢেউ উঠল; এমনকি জাহাজের উপরে জল উঠতে লাগল। হিন্দুরা চিৎকার করে বলতে লাগল, "পবন, রক্ষা কর; মা গঙ্গা রক্ষা কর।" চন্দ্রলীলাও তাদের চিৎকারে যোগ দিলেন। ডেকের উপরে ভারি গোলমাল হওয়াতে ক্যাপ্টেন এসে সকলকে চুপ করতে বললেন; এবং আকাশের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বললেন; "ঐখানে যিনি আছেন, তিনি আমাদের ভাবনা ভাবেন।" এই প্রথমবার চন্দ্রলীলা শুনলেন যে তাঁদের আরাধ্য দেবতাগুলি ছাড়া একজন ঈশ্বর আছেন। এ পর্যন্ত তিনি মনে করেছেন, তাঁরা যে সকল দেবতার পূজা করেন

তারা ছাড়া আর অন্য কোনও উপাস্য দেবতা নেই; কিন্তু এখন তাঁর মনে হতে লাগল সর্বোপরিস্থ একজন আছেন, আর তিনিই সকলের জন্য চিন্তা করেন। অল্পক্ষণ পরে ঝড় থেমে গেল, কিন্তু তাঁর মনে যে নতুন চিন্তার উদয় হল, তা তিনি ভুলতে পারলেন না।

কলকাতা পৌঁছে তিনি এক সপ্তাহকাল গঙ্গা স্নান করলেন এবং কালীবাড়িতে ডালা (বা ভেট) পাঠালেন। পরে নয় টাকা দিয়ে একটি ছোট ঘোড়া কিনলেন এবং ঐ ঘোড়ার পিঠে নিজের জিনিসপত্র চাপিয়ে মেদিনীপুর অভিমুখে যাত্রা করলেন। কলকাতা থেকে মেদিনীপুর চল্লিশ ক্রোশ দূর। সেখানে পৌঁছে তিনি পঞ্চাগ্নির মধ্যে থেকে জপ করতেন। পূর্বের ন্যায় এবারেও তিনি যোগিনী বেশে থাকতেন এবং ফলমূল আহার করতেন। তাঁর প্রতিজ্ঞাত তিন বছর পূর্ণ হলেও তিনি চুলে চিরুনি দেননি, এইজন্য তাঁর মাথায় চুল জটা হয়ে গিয়েছিল। এইবার কলকাতায় থেকে তিনি মাথা মুড়ালেন এবং গঙ্গাস্নান করে সমস্ত চুল গঙ্গায় দিলেন। তবুও তাঁর মনে হল দেবতা নশ্বর মানুষের কাছে যা আশা করতে পারে, তিনি তার সমস্তই করেছেন, কিন্তু কোনও ফল হয়নি।

সপ্তম অধ্যায়
শৃঙ্খল মোচন

চন্দ্রলীলা আবার মেদিনীপুর গেলেন। এবার তিনি কয়েকজন শিষ্য সংগ্রহ করলেন। শিষ্যদের মধ্যে একটি ছেলে ছিল। এই ছেলেটিকে তিনি ভালোবাসতেন। এই ছেলেটির সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত এই:

একদিন একটি স্ত্রীলোক এসে চন্দ্রলীলাকে প্রণাম করল এবং তাঁর পদধূলি নিয়ে বলল, “আমার একটি ভারি দুঃখের কথা আপনাকে বলতে চাই; আমার সন্তান হয় না। এইজন্য আমার স্বামী আবার বিবাহ করবেন। কী দিয়ে কোন দেবতার পূজা দিলে আমার সন্তান হবে, আমাকে দয়া করে বলে দিন।” চন্দ্রলীলা বললেন, “বোন, কী করলে যে দেবতারা প্রসন্ন হবেন তা আমি জানি না। কিন্তু আমার কাছে একরকম শিকড় আছে। যদি কোনও রোগ বা দুর্বলতার জন্য তুমি বন্ধ্যা হয়ে থাক, তাহলে এই ওষুধে তোমার রোগ সেরে যাবে এবং তোমার সন্তান হলেও হতে পারে।” স্ত্রীলোকটি ওষুধ নিয়ে গিয়ে খেল এবং কালক্রমে তার একটি পুত্র সন্তান জন্মিল। সে ছেলেটিকে এনে চন্দ্রলীলাকে দান করল। এই ছেলেটি হল চন্দ্রলীলার শিষ্য। তিনি বাল্যকাল থেকে তাকে শিক্ষা দিতে লাগলেন।

মেদিনীপুরে একজন রাজকর্মচারী লক্ষ্য করলেন যে, চন্দ্রলীলা এক নির্দিষ্ট স্থানে জপ করেন এবং শিষ্যদের শিক্ষা দেন। একদিন ঐ রাজকর্মচারীর স্ত্রী শাস্ত্রপাঠ শোনার জন্য চন্দ্রলীলাকে ডেকে পাঠালেন, তাঁর মুখে শাস্ত্রের ব্যাখ্যা শুনে বাড়ির লোকের এমন সন্তুষ্ট হল যে, ঐ রাজকর্মচারী নিজের বাড়িতে তাঁকে রাখার জন্য একখানি ঘর ছেড়ে দিলেন। কয়েকটি বিগ্রহ নিয়ে চন্দ্রলীলা এই বাড়িতে থাকলেন। বলাবাহুল্য যে, বিগ্রহ সঙ্গে না নিয়ে তিনি কোথাও যেতেন না।

এখানে থেকে চন্দ্রলীলা অনেক স্ত্রীলোককে শাস্ত্র পড়ে শোনাতেন এবং তাদের নিয়ে নানা ব্রত পালন ও পূজা করতেন। কিন্তু এই সময়ে বিগ্রহের উপরে তাঁর আর পূর্বের মতো বিশ্বাস ছিল না। নগরের অনেক বড়ো লোকের বাড়িতে তিনি যেতে পারতেন; আর যেখানেই যেতেন সেখানেই সকলকে শাস্ত্র থেকে শিক্ষা দিতেন। এইসকল করতে করতে তাঁর মন ক্রমে বিরক্ত হয়ে উঠল, বিগ্রহের উপরে তাঁর মনে যে অভক্তি জন্মেছিল, তাও বৃদ্ধি পেল। অবশেষে একদিন বিগ্রহগুলি একত্র করে এক বৈষ্ণবীর হাতে দিয়ে বললেন, "যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তুমি এগুলির পূজা কোরো। আমি অনেকদিন পূজা করেছি, কিন্তু আমার কোনও লাভ হয়নি। আর আমি এইপ্রকার পূজা করব না।" এই বৈষ্ণবী চন্দ্রলীলার থেকে নিচু জাতের ছিল এবং সে বিগ্রহগুলি নিয়ে চলে গেল।

বালক শিষ্যের বাড়ি চন্দ্রলীলা ঘনঘন যেতেন। এই বালকের একটি ছোট বোন ছিল। বোনটির বিবাহ হলে সে শ্বশুর বাড়ি গেল। তাঁর শ্বশুর বাড়ির কাছেই ছিল মিশন বাড়ি এবং মিশন বাড়িতে ডাক্তার ফিলিপ সপরিবারে বাস করতেন। ফিলিপ সাহেবের বোন মিস জুলিয়া ফিলিপ লোকের বাড়ি গিয়ে স্ত্রীলোকদের ধর্মশিক্ষা দিতেন এবং চন্দ্রলীলার বালক শিষ্যের বোনকেও শিক্ষা দিতেন। এই বালিকার নাম ছিল পার্বতী। একদিন চন্দ্রলীলা পার্বতীর বাড়ি গিয়ে দেখলেন, সে খ্রীষ্টিয়ানদের একখানি বই পড়ছে। এই পর্যন্ত চন্দ্রলীলা খ্রীষ্টিয়ানদের কোনও বই কখনও দেখেনি। এইজন্য তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "পার্বতী এই বই কোথায় পেলে?"

"এক মেম আমাকে পড়াতে আসেন, তিনি দিয়েছেন।"

"মেমের সঙ্গে কি আমি দেখা করতে পারি?"

"পারেন বই কি। কাল তিনটের সময় আসুন, তাহলে দেখা হবে।"

"আচ্ছা, আমি ঠিক আসব।"

চন্দ্রলীলা আসলেন; কিন্তু কোনও কারণবশত সেইদিন মেম আসলেন না। মেম নিজে না আসতে পারলেও একজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক ও সূর্যমুখী নামে এক যুবতীকে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁরা দেখে আশ্চর্য্যান্বিত হলেন যে, যোগিনী চন্দ্রলীলার মনে মেমকে দেখবার প্রবল ইচ্ছা জন্মেছে। তাঁরা ঘরে ফিরে এসে শ্রীমতি ফিলিপকে বললেন, "এক অদ্ভুত যোগিনীর সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছে। তিনি আমাদের বাইবেল পড়ে শোনাতে বলেছেন।" পরদিন শ্রীমতি ফিলিপ চন্দ্রলীলার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন। সেইদিন জীবনে প্রথমবার চন্দ্রলীলা দু'জন বিদেশি মহিলার কাছে খ্রীষ্টের সুসমাচার শুনলেন। তিনি মেমদের কাছ থেকে একখানি ব্যাকরণ কিনে নিলেন। মেমরা তাঁর হাতে একখানি বাংলা বাইবেল দিয়ে বললেন, "এটি আমাদের ধর্মপুস্তক। এটি পড়লে আত্মার মঙ্গল হয়।" চন্দ্রলীলা ধর্মপুস্তকখানি মাত্র আট আনা দাম দিয়ে কিনলেন এবং ঘরে নিয়ে গেলেন। তিনি সেটি রাতদিন পড়তে লাগলেন। দিন কতকের মধ্যে তাঁর কাছে এত ছাত্র জুটল যে, ছোটখাটো একটি স্কুলে পরিণত হল। মেমরা ও তাঁদের সাহায্যকারিণীরা এসে চন্দ্রলীলা ও তাঁর স্কুলের ছাত্রদের শিক্ষা দিতে লাগলেন। কিন্তু এতেও চন্দ্রলীলা তৃপ্ত হলেন না। যীশু ও তাঁর ধর্ম সম্বন্ধে আরও ভলো করে জানার জন্য তিনি মিশনারি বাড়িতে যাতায়াত করতে লাগলেন। মেমরাও খুব যত্ন করে তাঁকে শিক্ষা দিতে থাকলেন। অল্প দিনের মধ্যেই বাইবেল তাঁর এত প্রিয় হয়ে উঠল যে, তিনি কেবল নিজে পড়েই সুখী হলেন না, নিজের শিষ্যদেরকেও পড়াতে লাগলেন।

একদিন শিষ্যেরা আগের মতো রামায়ণ শাস্ত্র পড়তে আসলে তিনি বললেন, "আমরা ঐ সমস্ত বই পড়ব না, আমরা নতুন বই পড়ব।" এই কথা শুনে কেউ কেউ বলল, "কেন পুরাতন বই পড়বেন না?" চন্দ্রলীলা বললেন, "এই নতুন বইটি বড়ো ভালো।" স্ত্রীলোকেরা শুনে সন্তুষ্ট হল বটে, কিন্তু পুরুষেরা বলল,

"আপনি কী বই পড়ছেন? এ যে খ্রীষ্টিয়ান বই। আপনি কি তবে খ্রীষ্টিয়ান হবেন? আপনি পাদ্রী সাহেবের বাড়ি আর যাবেন না। আমরা এক পণ্ডিত এনে দেব, তাঁর কাছে আপনি ঘরে বসে ব্যাকরণ শিখতে পারবেন।" চন্দ্রলীলা উত্তর দিলেন, "না, পণ্ডিতদের কাছে পড়ব না, ঐ মেমদের কাছেই গিয়ে শিখব।" তখন তারা ভয় দেখিয়ে বলল, "যদি খ্রীষ্টিয়ান হন আমরা আপনাকে তাড়িয়ে দেব; লোকে আপনাকে পাগল বলবে ও মারধর করবে। খ্রীষ্টিয়ানরা নতুন নতুন দিনকতক বেশ যত্ন করবে;কিন্তু শেষে ডেকেও জিজ্ঞাসা করবে না, তখন আপনার কী দশা হবে?" তিনি উত্তর দিলেন, "যীশু ঈশ্বর, তাঁর জন্য মরলে আমি পরিত্রাণ পাব। আমি কোনও ভয় করি না। তোমরা আমাকে ধরে রাখতে পারবে না এইজন্য তোমাদের বলছি, বৃথা চেষ্টা কোরো না। তোমাদেরও খ্রীষ্টিয়ান হওয়া উচিত।" এই কথা বলে তিনি তাদের কাছে যীশুর বিষয় বললেন এবং এই নতুন ধর্মের কথা যা শিখেছিলেন, তা তাদের বুঝিয়ে দিলেন।

দু'মাস শিক্ষা গ্রহণ করার পরে চন্দ্রলীলা মিশনারিদের কাছে খ্রীষ্টিয়ান হওয়ার ইছা প্রকাশ করলেন। একদিন মিশন বাড়িতে ডাক্তার ফিলিপ ও তাঁর পিতার সাথে চন্দ্রলীলার সাক্ষাৎ হল। ডাক্তার ফিলিপের পিতা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার বাড়ি কোথায়?"

"আমার বাড়ি নেপালে।"

"আপনি কি সাধু না পাপী?"

"পাপেতেই আমার পিতামাতার জন্ম হয়েছিল, আমারও তাই। আমি অনেক দেশ ঘুরে অনেক প্রতিমার পূজা করেছি। তাতে আমার কোনও ফল হয়নি।"

তখন ডাক্তার ফিলিপ জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি অনেক দেতার পূজা

করেছেন, তবুও কি পাপের ক্ষমা পাননি?" চন্দ্রলীলা বললেন, "যত প্রকার দেববিগ্রহ আছে বলে জানি, প্রায় সকলেরই পূজা করেছি; প্রায় সকল তীর্থে গিয়ে শাস্ত্র অনুযায়ী অনেক কাজ করেছি, কিন্তু ক্ষমার কথা ও মনের শান্তির কথা বলতে পারি না।" ডাক্তার ফিলিপ আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার দেব বিগ্রহেরা কি পাপ ক্ষমা করতে পারেন না? আর যদি যথার্থই তারা না পারে, তবে আপনি কেমন করে ক্ষমা পাবেন?" চন্দ্রলীলা উত্তর দিলেন "আমি সম্প্রতি যীশুর বিষয়ে পড়েছি যে, তিনিই পাপীর ত্রাণকর্তা। তিনি আমাকে দয়া করে ক্ষমা করতে পারেন, আমি তা বিশ্বাস করছি।" তখন মিস জুলিয়া ফিলিপ জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি তো অনেক দেবমন্দির দেখেছেন, আমাদের গির্জা কখনও দেখেছেন কি?" তিনি বললেন, "না খ্রীষ্টিয়ানদের গির্জা কখনও দেখিনি। কখন আপনাদের গির্জা দেখতে পারি?" মিস জুলিয়া ফিলিপ বললেন, "কাল বিকালে আমাদের গির্জাঘরে উপাসনা হবে;তখন কি আপনি আসতে পারবেন?" পরে তিনি চন্দ্রলীলাকে গির্জাঘর দেখিয়ে দিলেন।

প্রথমবার গির্জায় গিয়ে চন্দ্রলীলার মনে যে ভাব হয়েছিল, সেই বিষয়ে তিনি নিজেই বলেছেন:

নিরূপিত সময়ে আমি গির্জায় গেলাম। এইসময়ে আমার মাথার চুল আবার কতকটা বেড়েছিল এবং আমি ধুতি পরতাম। গির্জাঘরের ভিতরে প্রবেশের পূর্বে আঁচল দিয়ে গা ও মাথা ঢাকলাম। ডাক্তার ফিলিপ সেদিন উপাসনা চালিয়েছিলেন। তাঁর মুখে এই প্রথমবার ধর্মপদেশ শুনলাম। শুনতে শুনতে আমার মন উত্তেজিত হয়ে উঠল। আমার মনে হল এতদিন যা খুঁজে বেড়িয়েছি, তা পেয়েছি। তখন আমার মনে দৃঢ় ইচ্ছা জন্মাল যে, হিন্দু ধর্ম ও তৎসংক্রান্ত প্রবঞ্চনা একেবারে পরিত্যাগ করব।"

উপাসনা শেষ হলে ডাক্তার ফিলিপ ও মণ্ডলীর পালক এসে তাঁর সঙ্গে কথা বললেন। তিনি ডাক্তার ফিলিপকে বললেন, 'সাহেব, আমি বাপ্তাইজিত হতে চাই।" তিনি উত্তর দিলেন, "খ্রীষ্টিয়ান হলে আপনার ভারি কষ্ট হবে, সকলেই আপনাকে পরিত্যাগ করবে;আর খেতে না পেলে আপনি কী করবেন?" চন্দ্রলীলা বললেন, "ঈশ্বর পাখিদের খেতে দেন, আর আমাকে কি দুটি খেতে দেবেন না? যিনি মুখ দিয়েছেন, মুখে দেওয়ার জন্য অন্নও তিনি যোগাবেন। ঈশ্বর আমার তত্ত্ব নেবেন, আমি খাওয়ার জন্য কোনও চিন্তা করি না।"

পরে সাহেব তাঁর নাম জিজ্ঞাসা করে জেনে নিলেন, কারণ তিনি তাঁকে যোগিনী বলেই জানতেন, তাঁর নাম জানতেন না। গির্জা থেকে চন্দ্রলীলা ঘরে ফিরে গেলেন। তিনি নিজেই বলেছেন, "সেই রাত্রে একটুও ঘুম হল না। বিছানায় শুয়ে আমি ভাবতে লাগলাম কবে সমস্ত কিছু ছেড়ে প্রভু যীশুর হতে পারব!"

আরও এক সপ্তাহ তিনি মিশনারিদের কাছে শিক্ষা করলেন। পরে ডাক্তার ফিলিপের কাছে গিয়ে তিনি বললেন, "আমি এখন হিন্দু বন্ধুদের ত্যাগ করে আসবার আয়োজন করতে চাই। একটু দূরে কোনও বন্ধুর বাড়িতে আমার কিছু টাকা ও পিতল, কাঁসার বাসন আছে। আমি গিয়ে সেইগুলি নিয়ে আসব?" ডাক্তার ফিলিপ বললেন, '"আমার ভয় হচ্ছে, আপনি হয়তো প্রলোভনে পড়বেন; আপনার বন্ধু আপনাকে ফিরে আসতে নাও দিতে পারে।" তখন চন্দ্রলীলা বললেন, "তবে যাবই না।"

এক বৈষ্ণবীর ঘরে তাঁর নিজের কতকগুলি বই ও বিগ্রহ জমা ছিল। এই বইগুলি হিন্দুশাস্ত্র এবং বিগ্রহগুলি ছিল তাঁর উপাস্য। এগুলি আনার জন্য ডাক্তার ফিলিপ চন্দ্রলীলার সঙ্গে একটি স্ত্রীলোককে পাঠিয়েছিলেন। পূর্বে যে শিষ্যের বাড়িতে তিনি থাকতেন, তারই বাড়িতে এগুলি এনে রাখলেন। বাড়ির লোক

তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, "রাত্রে পূজা করবার জন্য কি এগুলি আনলেন?" তিনি উত্তর দিলেন, "না অনেক দিন এগুলির পূজা করা ছেড়ে দিয়েছি।" এদের মধ্যে রামের একটি মূর্তি ছিল। এই মূর্তি নিয়ে তিনি সমস্ত স্থানে বেড়িয়েছেন এবং এই কয়েক বছর প্রতিদিন এটির পূজা করেছেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে এক বুধবার সকালবেলা নিজের সমস্ত কিছু নিয়ে চন্দ্রলীলা পালকের বাড়ি আসলেন। অল্পক্ষণের মধ্যে সারা শহর জানতে পারল যে, চন্দ্রলীলা মিশনারিদের কাছে চলে গেছেন;তিনি খ্রীষ্টিয়ান হবেন। তখন তাঁর শিষ্যরা ও অন্য অনেকে তাঁকে ফিরিয়ে আনতে তাঁর কাছে গেল। তাদের দেখে চন্দ্রলীলা বারান্দায় গিয়ে বললেন, "আমি এখন আর হিন্দু নই, কাজেই তোমাদের আর হিন্দু ধর্মশিক্ষা দিতে পারি না।" নিজের কথা সপ্রমাণ করবার জন্য পালকের স্ত্রীর কাছে জল চেয়ে তাদের সামনেই পান করলেন। পরে আর একজনের কাছ থেকে হুঁকা চেয়ে নিয়ে খ্রীষ্টিয়ানদের সঙ্গে বসে তামাক খেলেনে। এইপ্রকারে যখন এই লোকদের সাক্ষাতেই তিনি জাত নষ্ট করলেন, তখন তারা দুঃখিত ও নিরাশ হয়ে এই কথা বলতে বলতে চলে গেল, যখন জাত গিয়েছে তখন আর চেষ্টা করে কোনও ফল নাই। যদিও চন্দ্রলীলা এইসময়ে তামাক খেয়েছিলেন, কিন্তু এর পরে আর কখনও খাননি। অনেকদিন থেকে তাঁর মনে ধারণা জন্মেছিল যে, মদ ও তামাকে হৃদয়ের পবিত্রতা নষ্ট হতে পারে।

আমরা আগে দেখেছি যে, মেদিনীপুর থেকে দশ ক্রোশ দূরে এক রাজার বাড়িতে চন্দ্রলীলা সাত বছর ছিলেন। সেই রাজার ছেলে যখন শুনতে পেলেন যে, চন্দ্রলীলা খ্রীষ্টিয়ানদের কাছে গিয়েছেন, তখন তিনি তাঁকে নিজের কাছে আনার জন্য লোকজনসহ হাতি পাঠিয়ে দিলেন। রাজার লোকেরা এসে যখন শুনল যে, তাঁর জাত গিয়েছে তখন তাঁরা চলে গেল, তাঁর সঙ্গে দেখাও করল না। এর পরে তিনি নিজেই একবার রাজবাড়িতে গিয়ে রাজপুত্রের কাছে খ্রীষ্টকে প্রচার করেছিলেন,

এবং বাইবেল থেকে তাঁকে ধর্মশিক্ষা দিয়েছিলেন। রাজপুত্র একজন গুপ্ত বিশ্বাসী হয়েছিলেন। যদি উচ্চপদ ও আত্মীয়স্বজন বিশেষ বাধাস্বরূপ না হত, তাহলে তিনি নিশ্চয়ই প্রকাশ্যভবে খ্রীষ্টকে ত্রাণকর্তা বলে স্বীকার করতেন।

মণ্ডলীর পালকের ঘরে চন্দ্রলীলা একমাস রইলেন। এখানে তিনি বাইবেল পড়ে ও খ্রীষ্টধর্মের শিক্ষা আলোচনা করে অধিকাংশ সময় কাটাতেন। একদিন বহু লোকের সাক্ষাতে ডাক্তার ফিলিপ চন্দ্রলীলাকে বাপ্তাইজিত করলেন। এই দিনের ঘটনা তিনি আজীবন ভুলতে পারেননি, যাঁরা তাঁর জন্য চিন্তা ও প্রার্থনা করতেন, তাঁরাও ভুলতে পারবেন না। পৌত্তলিকতার বন্ধন থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত এই মহিলাকে বাপ্তিস্ম দিয়ে ও তাঁকে প্রভুর ভোজের অংশগ্রহণ করতে দেখে পাদ্রী ফিলিপও আনন্দিত হলেন।

অষ্টম অধ্যায়
অর্থ উপার্জন ও ধর্মপ্রচার

বাপ্তিস্মের পর প্রচারিকাদের সঙ্গে লোকের বাড়ি গিয়ে স্ত্রীলোকদের ও বিদ্যালয়ে গিয়ে বালিকাদের শিক্ষা দিতে চন্দ্রলীলাকে নিযুক্ত করা হল। তাঁর কিন্তু ছোট মেয়েদের ক, খ, ও বয়স্কদের বই পড়াতে ভালো লাগল না। তিনি বাইবেল হাতে নিয়ে বাড়ি বাড়ি ও রাস্তায় প্রচার করতে লাগলেন। তাঁর কথা শোনার জন্য রাস্তায় অনেক লোক একত্র হত। দিনের বেলা প্রায়ই তাঁর আহার ও বিশ্রাম করার সময় হত না। রাত্রে তিনি নিজ হাতে রান্না করে খেতেন। ডাক্তার ফিলিপ এই দেখে তাঁকে প্রচার কাজেই নিযুক্ত করলেন এবং তিনি ইচ্ছানুযায়ী প্রচার করতে লাগলেন। প্রথম তিন বছর তিনি মেদিনীপুর শহর ও শহরের অশেপাশে প্রচার করলেন। তাঁর খ্রীষ্টিয়ান হওয়ার দু'বছর পরে তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই নেপাল থেকে অন্য কতকগুলি লোকের সঙ্গে জগন্নাথ যাওয়ার পথে এখানে আসলেন। তিনি বোনের সাথে দেখা করে দু'দিন তাঁর কাছে থাকলেন। অবশ্য বোনের সঙ্গে থাকলেও তিনি আলাদা ঘরে নিজে রেঁধে খেতেন। এই দু'দিন তিনি চন্দ্রলীলার কাছে যীশুর শিক্ষা ও আশ্চর্য পরিত্রাণ কাহিনী শুনলেন। ডাক্তার ফিলিপ তাঁকে একখানি বাইবেল দিলেন। তিনি একদিন গির্জায় গিয়ে খ্রীষ্টিয়ানদের উপাসনাও দেখলেন।

এইসময়ে চন্দ্রলীলা একবার মুর্শিদাবাদ যেতে ইচ্ছা করলেন। পূর্বে যখন তিনি সেখানে গিয়েছিলেন, তখন তিনি প্রতিমা পূজা করতেন। আর এখন স্থির করলেন, সেখানে গিয়ে খ্রীষ্টকে প্রচার করবেন। এই সঙ্কল্প অনুযায়ী তিনি যাত্রা করলেন। পথে কোনও কোনও স্থানে দুই এক মাস থেকে পথিক ও অন্য লোকদের কাছে সুসমাচার প্রচার করলেন। এক জায়গায় তাঁর এক মাস থাকতে ইচ্ছা হল, কিন্তু হিসাব করে দেখলেন, সঙ্গে যে টাকা আছে তাতে এক মাসের খরচ কুলাবে না। কিছু অর্থ উপার্জন করার জন্য তিনি কয়েক টাকার আম, কাঁঠাল ইত্যাদি ফল

কিনলেন এবং এক অশ্বত্থ গাছের তলায় দোকান খুলে বসলেন। তিনি ভাবলেন এখানে বসে প্রচার করতে ও ফল বেচতে পারবেন এবং এতে তাঁর আহারের সংস্থানও হবে। প্রচার করতে আরম্ভ করলে অনেক লোক তাঁকে ঘিরে দাঁড়াল। কথা বলতে বলতে তিনি এমন আত্মহারা হলেন যে, দোকানের আম, কাঁঠালের কথা ভুলে গেলেন; আর দুষ্ট লোকে সুযোগ পেয়ে অনেকগুলি ফল চুরি করে নিয়ে গেল, অবশিষ্ট যা ছিল, তা বেচে হিসাব করে দেখলেন, দোকানে লাভ না হয়ে বারো আনা লোকসান হয়েছে। তখন তাঁর মনে হল, আম, কাঁঠাল বেচে পয়সা উপায় করা হয়তো প্রভুর ইচ্ছা নয়, তাঁর উপরে নির্ভর করলে তিনিই আহার-বস্ত্র যোগাবেন। অনেকবার দেখা গিয়েছে যে, অনেকক্ষণ প্রচার করে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন এবং দয়ালু লোকে তাঁকে ক্ষুধার্ত দেখে আহার এনে দিয়েছে।

একবার একটা জঙ্গলের মধ্য দিয়ে তাঁকে যেতে হয়েছিল। জঙ্গলের মধ্যে ভালো রাস্তা ছিল না, হেঁটে যেতে তাঁর ভারি কষ্ট হল। তাঁর সঙ্গে খাবার কিছুই নেই, পথে জলও পাওয়া গেল না। এইজন্য একপ্রকার লতার রস খেয়ে তাঁকে পথ চলতে হল। সন্ধ্যাবেলা জঙ্গল পার হয়ে একটি ছোট গ্রাম পেলেন। যদিও তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত ছিলেন, তথাপি সচরাচর যেমন করে থাকেন, তেমন এক স্থানে বসে প্রচার করতে লাগলেন; তাতে অনেকে এসে তাঁকে ঘিরে দাঁড়াল ও তাঁর কথা শুনতে লাগল। এই লোকেরা এর আগে কখনও যীশুর কথা শোনেনি। তাদের কাছে প্রচার করতে করতে তিনি ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভুলে গেলেন। অবশেষে একটি স্ত্রীলোক তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, "আপনার খাওয়া-দাওয়া কোথায় হবে?" তিনি বললেন "কিছুই জানি না।" স্ত্রীলোকটি তাঁকে ভাত খেতে দিতে চাইল। চন্দ্রলীলা কোনও আপত্তি না করাতে সে তাড়াতাড়ি গিয়ে ভাত-তরকারি, দই ও মিষ্টি নিয়ে আনল। খিদের সময়ে ঈশ্বর প্রচুর আহার জুগিয়ে দিয়েছেন বলে তিনি তাঁর ধন্যবাদ করলেন এবং খেয়ে শুয়ে পড়লেন। রাত্রে খুব ভালো ঘুম হওয়াতে তাঁর ক্লান্তিও দূর হল। সকালবেলা উঠে তিনি শরীরে বেশ বল পেলেন এবং আবার প্রচার করতে লাগলেন।

কয়েকদিন পরে ডাক্তার ফিলিপের সাহায্য করতে তিনি আবার মেদিনীপুরে আসলেন। একদিন প্রচার করতে যাওয়ার সময়ে ডাক্তার ফিলিপ তাঁকে বললেন, "টাকা-পয়সা সঙ্গে না নিয়ে যাচ্ছেন, কী দিয়ে চাল, ডাল কিনবেন? যখন যোগিনী ছিলেন তখন লোকে ভক্তি করে আপনাকে খাওয়াত। এখন কিন্তু নাও খাওয়াতে পারে; আর যদি না খাওয়ায়, তাহলে আপনার ভারি কষ্ট হবে। যদি পয়সা একান্তই না নিতে চান, তাহলে বই বিক্রির পয়সা খরচ করে খাবেন।" তিনি এই কথাতে রাজি হলেন বটে, কিন্তু তাঁর মনে যেন একটা ধোঁকা থেকে গেল।

থলি ভরে বই নিয়ে চন্দ্রলীলা প্রচারযাত্রায় বের হলেন, কয়েকখানি বই বিক্রি হল। প্রচার করতে আরম্ভ করলে লোক জমল। তিনি একমনে প্রচার করতে লাগলেন যে, বইয়ের কথা ভুলে গেলেন। কোনও কোনও দুষ্ট লোক তখন সুযোগ পেয়ে বইগুলি চুরি করল। পরে তিনি ডাক্তার ফিলিপের কাছে ফিরে এসে থলিটি তাঁকে দেখালেন এবং সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁকে জানিয়ে বললেন, "সংসারের আর কোনও কাজ করতে আমার ভালো লাগে না, কেবল সুসমাচার প্রচার করাই আমার কাজ।।" যদি খ্রীষ্টের 'রাজদূতেরা" সকলেই চন্দ্রলীলার মতো নিজেদের কর্তব্য স্পষ্ট করে বুঝতেন ও স্থির করে নিতেন তাহলে বড়ই সুখের বিষয় হত।

চন্দ্রলীলা মেদিনীপুর জেলার অনেক গ্রামে ও গৃহস্থের বাড়ি সুসমাচার প্রচার করেছিলেন। এখন তাঁর ইচ্ছা হল জেলার সকল মানুষের কাছে মুক্তির পথ প্রকাশ করবেন। এই ইচ্ছানুযায়ী জেলার সর্বত্র বেড়িয়ে সুসমাচার প্রচার করতে ছয় মাস লাগল। তাঁর অক্লান্ত চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে অনেকের মন যীশুর দিকে আকৃষ্ট হল, অনেকে প্রকাশ্যরূপে যীশুকে মুক্তিদাতা বলে স্বীকার করল। যারা প্রকাশ্যভাবে খ্রীষ্টিয়ান হল, তাদের আত্মীয়-স্বজনেরা তাদের বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিল। চন্দ্রলীলা এই লোকদের নিজের কাছে আনলেন এবং যতদিন তাদের কোনও স্থায়ী বন্দোবস্ত না হল, ততদিন তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করলেন। ঈশ্বর যদি চন্দ্রলীলার মতো একদল কার্যবীর এ দেশে উৎপন্ন করতেন, বড়ই আনন্দের বিষয় হত। এমন লোকদের প্রয়োজন আছে, যাঁরা সকল স্থানে, সকল মানুষের বাড়ি এবং যারা সুসমাচার

কখনও শোনেনি তাদের কাছে খ্রীষ্টকে প্রচার করতে প্রস্তুত। তিব্বতের মতো যে যে স্থানে কোনও মিশনারি যেতে পারেননি, সেই স্থানে খ্রীষ্টের কার্যকারীদের যেতে চেষ্টা করা উচিত। কারণ সকল মানুষের কাছে সুসমাচার প্রচার হওয়া আবশ্যক। লোকে যাই মনে করুক না কেন একথা একেবারে সত্য যে, খ্রীষ্টের জন্য আনন্দের সাথে কঠিন পরিশ্রম ও দুঃখভোগ করা প্রকৃত বীরত্ব। প্রভু যীশু "সমুদয় সৃষ্টির নিকটে সুসমাচার প্রচার" করতে বলেছেন; আর আমরা জানি, এখনও হাজার হাজার লোক আছে, যারা সত্য ঈশ্বরকে জানে না। এই অজ্ঞ লোকদের ঈশ্বরের সাধিত মহা পরিত্রাণের সংবাদ দেওয়া খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীর কর্তব্য। আমরা যদি প্রতিদিন প্রভুর এই আদেশ পালন করতে চেষ্টা করতাম, যদি সুসমাচার প্রচার করতে প্রাণপণে পরিশ্রম করতে পারতাম, তাহলে আমাদের দেশ ঈশ্বরের জ্ঞানে পূর্ণ হত। আমরা যেন আগ্রহের সাথে প্রার্থনা করি, যেন ক্ষেত্রস্বামী নিজ ক্ষেতে এইপ্রকার কার্যকারীর সংখ্যা বহুগুণে বৃদ্ধি করেন।

এর কয়েক মাস পরে চন্দ্রলীলার এক ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁর কাছে আসল। তিনি তাকে যীশুর প্রেমের বিষয় শিক্ষা দিলেন এবং তার মন পরিবর্তনার্থে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে থাকলেন। আর অত্যন্ত আনন্দের বিষয় এই যে, অল্পদিনের মধ্যেই সে যীশুকে ত্রাণকর্তা বলে জানতে পারল এবং বাপ্তাইজিত হতে চাইল; কিন্তু তখনও সে সাবালক হয়নি বলে মিশনারিরা তাকে তার আত্মীয়-স্বজনের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। বাড়ি ফিরে যাওয়ার অল্পদিন পরেই বালকটির মৃত্যু হল। চন্দ্রলীলার বিশ্বাস যে সে খ্রীষ্টের দ্বারা পরিত্রাণের অধিকারী হয়েছে।

চন্দ্রলীলা কেবল মেদিনীপুর জেলার ডাক্তার ফিলিপের সঙ্গে নয়, কিন্তু অন্য জেলায় অন্য মিশনারিদের সঙ্গেও প্রচার করেছেন। যাঁরা তাঁর প্রচার শুনেছেন তাঁরা সকলেই বলেন, চন্দ্রলীলার প্রচার করার ক্ষমতা অতি আশ্চর্য। যখন তাঁর মন বলত যে, কোনও স্থানের লোকদের পরিত্রাণের সংবাদ দিতে প্রভু ডেকেছেন, তিনি দেরি না করে অমনি তাদের কাছে যেতে প্রস্তুত হতেন।

নবম অধ্যায়
নিজের ভাইকে বাপ্তিস্ম দান

এই সময়ে চন্দ্রলীলা কিছু সময়ের জন্য পূর্বপরিচিত ভিন্ন ভিন্ন তীর্থে ও মেলায় প্রচার করতে গেলেন। তিনি যীশুকে পেয়ে পরম সুখী হয়েছিলেন এবং অনেক পরিচিত স্ত্রী, পুরুষের কাছে যীশুর কথা বলার সুযোগ পেয়ে আরও সুখী হলেন। এখন তিনি পূর্বের ন্যায় ময়লা কাপড় নয়, কিন্তু পরিষ্কার সাদা ধুতি পরেন, এখন তাঁর দেহ ভস্ম মাখা নয়, কিন্তু পরিষ্কার, এবং তাঁর শরীর উপবাসে শীর্ণ ও শুষ্ক নয়, কিন্তু সুস্থ ও সবল। পূর্বে যারা তাঁকে দেখেছিল এখন তারা তাঁকে দেখে নিশ্চয়ই আশ্চর্য্যান্বিত হয়েছিল।

প্রয়াগের মেলায় হাজার হাজার লোক উপস্থিত হয়। চন্দ্রলীলা এখানে একমাস থেকে সুসমাচার প্রচার করলেন। এখানে থাকবার সময় একদিন তিনি যাত্রিদের সাক্ষাতেই পাণ্ডাদের প্রতারণা ধরিয়ে দিলেন; তাতে পাণ্ডারা এত রেগে গেল যে, তাঁকে মারবার ভয় দেখিয়েই ক্ষান্ত থাকল না, কিন্তু তাদের কুঅভিসন্ধি পূর্ণ করার জন্য কতকগুলি গুণ্ডা ভাড়া করল। একদিন তিনি মাটিতে বসে প্রচার করছেন, তখন ঐ লোকেরা এসে তাঁর কাজে বাধা দিল। তিনি অতি ধীরভাবে ও সাহসের সাথে দলপতির সঙ্গে কথা বললেন। তিনি স্পষ্ট করে বললেন, "আমি তোমাদের বন্ধু, ভবিষ্যৎ বিপদের সম্বন্ধে সাবধান করে দিয়ে বন্ধুর উপযুক্ত কাজই করছি, অথচ আমাকে মারার জন্য ইঁট হাতে নিয়েছ। যদি চাও তো মার, কিন্তু মনে রেখ, তাতে আমার কিছু হবে না, তোমাদেরই ক্ষতি হবে। ঈশ্বরের দণ্ড থেকে তোমরা যেন রক্ষা পাও, আমি এই প্রার্থনা করছি।" এইপ্রকারে মিষ্ট কথা ও সাহস দ্বারা তিনি এই লোকদের শান্ত করলেন। পরে তারা আস্তে আস্তে চলে গেল, কেউই তাঁকে ইঁট মারল না।

এর পরে তিনি আসামের নানা স্থানে গেলে। যে রাণী পূর্বে যোগীনি অবস্থায় তাঁর অনেক উপকার করেছিলেন, তিনি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং সেই রাজবাড়িতে বসে বাইবেল পাঠ ও সুসমাচার প্রচার করলেন। তাঁর কথা রাজপুত্রের মন স্পর্শ করল। রাজপুত্র চন্দ্রলীলাকে চিনতে পেরে বললেন "পূর্বে যখন আপনি এখানে ছিলেন, তখন পঞ্চাগ্নির মধ্যে বসে জপ ও বিগ্রহের পূজা করতেন; আজ তার কিছুই দেখছি না। আজ দেখছি আপনার হাতে অন্য বই, এবং আপনার ভাব অন্য প্রকার; আর বলছেন, ত্রাণকর্তাকে পেয়েছেন। বলুন তো, এই পরিবর্তন কীসে হল?" তখন তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে, হিন্দু ধর্মরূপ সাগরের তলা পর্যন্ত খুঁজেও যা চান, তা না পেয়ে তিনি কিছুটা নিরাশ হয়েছিলেন এবং শেষে যীশু খ্রীষ্টতে বিশ্বাস করে পরিত্রাণ ও শান্তি পেয়ে সুখী হয়েছেন। তাঁর মুখে এইপ্রকার সাক্ষ্য শুনে অনেকের মন যীশুর দিকে আকৃষ্ট হল, কিন্তু জাতিকুল ত্যাগ করে প্রকাশ্যরূপে খ্রীষ্টের আশ্রয় গ্রহণ করতে কারও সাহস হল না।

সাতাশ বছর নানা দেশে বেড়িয়ে চন্দ্রলীলা নিজ জন্মভূমি নেপালে উপস্থিত হলেন। নেপালের রাজা নিজ রাজ্যের মধ্যে মিশনারিদের সুসমাচার প্রচার করতে দেন না; কিন্তু চন্দ্রলীলা দেশে গিয়ে চুপ করে থাকতে পারলেন না; যেখানে গেলেন, সেখানেই সুসমাচার প্রচার করলেন। নেপাল রাজ্যের মধ্যে বড়ো-ছত্রের মেলা খুব প্রসিদ্ধ। রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন স্থান থেকে অনেক লোক এই মেলায় এসে স্নান-দানধ্যান করে। এই মেলাতে তিনি ছোট-বড়ো সকলের কাছে খ্রীষ্টকে প্রচার করলেন এবং অনেক সুসমাচার খণ্ড ও পুস্তিকা বিতরণ করলেন; তাতে দেশের সর্বত্র লোকেরা ঐ সমস্ত বই নিয়ে গেল। পুলিশ এ দেখে চন্দ্রলীলাকে ধরে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পাঠিয়ে দিল। ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কে?" তিনি বললেন, "আমি নেপাল দেশেরই স্ত্রীলোক। আপনার লোকদের আমি ভালো বইই দিয়েছি।" ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর কথা শুনে তাঁকে ছেড়ে দিলেন, কিন্তু বলে দিলেন, যেন তাঁর আত্মীয়-স্বজন ছাড়া আর অন্য কাউকে এই বই না দেন। এই অনুমতি পেয়ে তিনি ফিরে এলেন, এবং যতদিন মেলা ছিল ততদিন বই বিতরণ করলেন, কেউ তাঁকে আর কোনও বাধা দিল না।

মেলা শেষ হলে তিনি আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা করলেন এবং নিজ বাড়িতে গিয়ে দেখলেন তাঁর বৈমাত্র ভাইটি অত্যন্ত পীড়িত। কয়েকদিন বাড়িতে থেকে, তিনি মায়ের মতো অতি যত্ন ও স্নেহের সাথে ছোট ভাইটির সেবা করলেন। একদিন তাঁর ভাই তাঁকে কাছে ডেকে বলল, "দিদি, আমি যীশুকে ত্রাণকর্তা বলে গ্রহণ করেছি। তোমার কাছে শিক্ষা পাওয়ার পর থেকে আমি তাঁরই সেবা করছি। তিনি কি আমাকে পাপ থেকে উদ্ধার করবেন?"

চন্দ্রলীলা বললেন, "হ্যাঁ ভাই নিশ্চয় তোমাকে উদ্ধার করবেন। তোমাকে পরিত্রাণ করতেই তিনি ক্রুশে প্রাণ দিয়েছেন।"

যুবকটি আগ্রহের সাথে বলল, "যথার্থই তিনি আমাকে গ্রহণ করবেন? আমি মনে করেছিলাম, স্ত্রী-পুত্র নিয়ে মেদিনীপুর যাব এবং প্রকাশ্যরূপে বাপ্তাইজিত হব। আমার আর বাঁচার আশা নেই, আমার মনের আশা মনেই রয়ে গেল। বাস্তবিক এখনই যীশু কি আমাকে গ্রহণ করবেন?"

চন্দ্রলীলা উত্তর করলেন, "হ্যাঁ ভাই, যীশু তোমাকে এখনই গ্রহণ করবেন। তোমার শরীর ও আত্মা এখনই যীশুর হাতে সঁপে দাও।"

যুবক বলল, "হ্যাঁ দিলাম; এখনই বিশ্বাস করছি, যীশু আমাকে উদ্ধার করেছেন। আমার ইচ্ছা, বাপ্তাইজিত হই।"

চন্দ্রলীলা বললেন, "এখানে তো কোনও পাদ্রী নেই—আমাদের দেশের মধ্যেও নেই; এত দূরে কেমন করেই বা একজনকে আনাই?"

যুবক আবার বলল, "পাদ্রী আনবার সময় নেই। কিন্তু দিদি, তুমি তো খ্রীষ্টিয়ান,

আর সুসমাচার প্রচার করে বেড়াও। তুমিই আমাকে বাপ্তাইজ কর না কেন? আমি খ্রীষ্টিয়ান হয়ে মরতে চাই।”

চন্দ্রলীলা ভাবতে লাগলেন, কী করবেন। তিনি ছোট ভাইটির মুখের দিকে চাইলেন, তাঁর মনে হল, এর মন-পরিবর্তনের জন্য তিনি এতদিন প্রার্থনা করেছেন। এইজন্য তিনি ছোট ভাইটিকে বললেন, “তোমাকে বাপ্তাইজ করলে ঈশ্বর কখনও আমার উপরে অসন্তুষ্ট হবেন না। এতদিন আমি কত দেব-দেবীর পুরোহিতের কাজ করেছি; আর এখন কি ভাইয়ের জন্য সত্য ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে কাজ করব না?” পরে তিনি আর কোনও কথা না বলে, সেই স্থান থেকে চলে গেলেন এবং একটি পাত্রে করে জল নিয়ে ফিরে আসলেন। পরে পাত্রটি রেখে ভাইয়ের পাশে হাঁটু গেঁড়ে এই প্রার্থনা করলেন, “প্রভু, তুমি নিজ গুণে অতি আশ্চর্যরূপে আমাকে মুক্তিদান করেছ এবং আমার ভাইয়ের মন পরিবর্তন করে আমার প্রার্থনার উত্তর দিয়েছ। এখন আমার ভাইকে পবিত্র আত্মায় পূর্ণ কর।” প্রার্থনার পরে তিনি পাত্র থেকে জল নিয়ে ভাইয়ের মাথায় ঢেলে দিয়ে বললেন, “ভাই আমি তোমাকে পবিত্র আত্মার নামে বাপ্তাইজ করিলাম। আমেন।”

এই অনুষ্ঠান এমন গম্ভীরভাবে পালন করা হল যে, তাদের মনে হল যে, ঈশ্বরের উপস্থিতিতে ঘরখানি পূর্ণ হয়েছে এবং স্বর্গীয় দূতেরা আগ্রহের সাথে নিরীক্ষণ করছেন। অনুষ্ঠান শেষ করে যখন তিনি উঠলেন তখন দেখলেন, তাঁর ভাইয়ের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে! সে যীশুকে প্রকাশ্যরূপে স্বীকার করতে পেরেছে বলে তার মনে হয়েছে এখন সে খ্রীষ্টিয়ান। এর কিছুদিন পরে স্বর্গদূতেরা আবার এই ঘরে আসলেন এবং এই যুবকের আত্মা নিয়ে স্বর্গে চলে গেলেন।

মৃত্যুর পরে আত্মীয়েরা হিন্দুদের রীতি অনুযায়ী এই যুবকের মৃতদেহের সৎকার করার আয়োজন করল। চন্দ্রলীলার কিন্তু ইচ্ছা ছিল এবং আত্মীয়দের অনুরোধও করেছিলেন, যেন তার ভাইয়ের মৃতদেহ কবর দেওয়া হয়; কিন্তু তারা তাঁর কথা

শুনতে চাইল না। তারা বলল, “তুমি তো খ্রীষ্টিয়ান; আমরা তোমার ভাইয়ের সম্বন্ধে তোমার কথামতো কাজ করব না।” তিনি উত্তর দিলেন, “আমার ভাইও যে খ্রীষ্টিয়ান ছিল এবং খ্রীষ্টিয়ানের মতোই সে মরেছে।” পরে তিনি তাঁর ভাইয়ের খ্রীষ্টিয়ান হওয়ার বিবরণ তাদের জানালেন এবং মরার আগে সে যে নিজ বাপ্তিস্মের কথা সকলের কাছে স্বীকার করেছে, তাও বললেন। কিন্তু তারা তাঁর কোনও কথা শুনল না। তিনি এতে অত্যন্ত দুঃখিত হলেন এবং অতি আগ্রহের সাথে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন।

এই ঘটনা যখন ঘটেছিল, তখন ছিল বর্ষাকাল। বৃষ্টিতে চারিদিক স্যাঁতস্যাঁতে হয়েছিল। সৎকারের সমস্ত আয়োজন করে তারা দেহটি শ্মশানে নিয়ে গেল। চন্দ্রলীলাও সঙ্গে গেলেন এবং তখনও ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে থাকলেন, যেন তাঁর মৃতদেহ দাহ করা না হয়। এইসময়ে মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হল। লোকেরা চিতা তৈরি করে দেহটি তার উপরে রেখে মুখাগ্নি করতে চেষ্টা করল, কিন্তু আগুন জ্বলল না। তারা বারবার নানাপ্রকারে আগুন জ্বালাতে চেষ্টা করল, কিন্তু কোনও মতে কৃতকার্য হল না। ক্রমে বৃষ্টি আরও বেশি হতে লাগল, তাতে চিতার চারিদিকে অনেক জল জমে গেল। এদিকে আবার বেলাও শেষ হয়ে আসল। তখন চন্দ্রলীলা তাদের বললেন, “আমাদের ঈশ্বরের ইচ্ছা নয় যে, তাঁর সন্তানের শবকে হিন্দুর মতো দাহ করা হয় এ কি তোমরা বুঝতে পারছ না? ঈশ্বর আমার প্রার্থনা শুনেছেন এবং শবদাহ নিবারণ করতে বৃষ্টি পাঠিয়ে দিয়েছেন। তোমরা এখন থাম, আর আমার ভাইয়ের মৃতদেহ আমাকে দাও, নতুবা ঈশ্বর অন্য কোনও ভয়ানক কিছু ঘটিয়ে দাহকার্য একেবারে বন্ধ করে দেবেন।” এইবার তারা চন্দ্রলীলার কথা শুনল; তাতে তিনি মৃতদেহটি নিয়ে খ্রীষ্টিয় রীতি অনুসারে কবর দিলেন।

দশম অধ্যায়
স্ত্রীলোকের কি প্রচার করা উচিত ?

চন্দ্রলীলা যখন প্রথমবার আমাদের বাড়ি এসেছিলেন, তখন আমরা না জেনে স্বর্গদূতের আতিথ্য করেছিলাম। তাঁর প্রফুল্ল মুখ এবং ধীর ও শান্ত ভাব দেখে আমাদের মনে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার উদয় হয়েছিল। অল্পকালের মধ্যে আমরা ঈশ্বরের কাজে তাঁর প্রবল ইচ্ছা ও অসাধারণ উদ্যোগ দেখতে পেলাম। তিনি সঙ্গীর অপেক্ষায় বসে থাকতেন না;একাই প্রতিদিন সকালবেলা বার হয়ে কখনও সন্ধ্যা, কখনও রাত্রি পর্যন্ত সুসমাচার প্রচার করতেন। একদিন হয়তো তিনি কোনও রাণীর কাছে বসে রাজবাড়ির সমস্ত স্ত্রীলোকদের কাছে বাইবেল পড়তেন;আর একদিন হয়তো বাজারে দাঁড়িয়ে বহু লোকের কাছে সুসমাচার প্রচার করতেন। যদি তিনি দেখতেন, কোনও স্থানে শিক্ষিত ভদ্রলোক একত্র হয়েছেন, তিনি নীরবে সেখানে যেতেন এবং যোগাসনে বসে আস্তে আস্তে তাদের সঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করতেন। প্রথমে তারা তাঁকে হেঁসে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করতেন, কিন্তু তাঁর কথা শুনে শীঘ্রই তারা বুঝতে পারত যে, তিনি সামান্য স্ত্রীলোক নন। হিন্দু শাস্ত্রে তাঁর জ্ঞান দেখে তাঁরা আশ্চর্য হতেন; শাস্ত্রের অর্ধেক শ্লোক তিনি অনর্গল বলতে পারতেন। তাঁর গুণের পরিচয় পেয়ে ক্রমে ক্রমে তারা কাছে এসে মাটিতে বসত এবং তিনি দুই-তিন ঘণ্টা ধরে তাদের প্রকৃত ধর্মতত্ত্ব বুঝিয়ে দিতেন। শেষে এমনভাবে তিনি যীশুর কথা উপস্থিত করতেন যে, তারা যীশুর বিষয়ে আরও জানবার জন্য উৎসুক হত। তিনি চারটি ভাষায় প্রচার করতে পারতেন। তাঁর সরল ও সাদাসিধা ভাব, তাঁর আত্মবিস্মৃতি, অন্যের উপকার করবার প্রবল ইচ্ছা এবং ঈশ্বরের উপরে দৃঢ় বিশ্বাস যেমন লোকের মন আকর্ষণ করত, তেমনই তা তাঁর জীবনকেও অতি মধুর করেছিল। এই সময়ে (১৯৪০ সালে) তাঁর বয়স পঁয়ষট্টি বৎসর হয়েছিল। যদিও তাঁর শরীর ক্রমে দুর্বল হয়ে আসছিল এবং চোখের

তেজ কমছিল, তবুও তিনি কুড়ি-পঁচিশ ক্রোশ দূরবর্তী স্থানে গিয়েও সুসমাচার প্রচার করতেন এবং সভা আহ্বান করে ধর্মশিক্ষা দিতেন। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে কত লোকের মন-পরিবর্তন হয়েছে তা কেউ জানে না, কিন্তু যখন তিনি গৌরব মুকুটে ভূষিত হবেন, তখন জানা যাবে।

এইসময়ে খ্রীষ্টিয়ান পণ্ডিতেরা আলোচনা করছিলেন এবং সংবাদপত্রেও লেখালেখি চলছিল যে, স্ত্রীলোকদের সুসমাচার প্রচার করতে দেওয়া উচিত কিনা, প্রকাশ্য সভায় স্ত্রীলোকদের প্রার্থনা করতে দেওয়া ভালো কিনা, এবং স্ত্রীলোকেরা সভাতে, বিশপ প্রভৃতি মণ্ডলীর কর্মচারীদের সঙ্গে বসতে পারবে কিনা;আর আমরা দেখি, চন্দ্রলীলার জীবনে এইসমস্ত বিষয় আপনা থেকেই মীমাংসিত হয়েছিল। পণ্ডিতেরা যে সময়ে তর্ক করছিলেন যে, স্ত্রীলোকেরা প্রচার করবে কিনা, তখন চন্দ্রলীলা ছোট-বড়ো, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, স্ত্রী-পুরুষ হাজার হাজার লোকের কাছে পরিত্রাণের সুসমাচার প্রচার করছিলেন। তাঁর মুখে সুসমাচার শুনে লোকে মোহিত হত, যদি অন্যরা তাঁর মতো চিত্তাকর্ষকভাবে পরিত্রাণের সংবাদ প্রচার করতে পারতেন, তাহলে তাঁরা কৃতার্থ হতেন। যে স্ত্রীলোকেরা ঈশ্বরকর্তৃক আহূত ও অভিষিক্ত, পুরুষে অনুমতি দিক কি না দিক, তাঁরা সুসমাচার প্রচার করবেনই করবেন। যদি আমাদের দেশের লোকেরা বাজে কথায় ব্যস্ত না থেকে, পরিত্রাণহীন লোকদের কাছে সুসমাচার প্রচার করতে মনোযোগী হতেন, তবে বড়ো ভালো হত।

চন্দ্রলীলার মতো অনেক সরলমনা সন্ন্যাসীনি ও যোগীনি নিরাশ মনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন— অনেক অমার্জিত হীরকখণ্ড যেখানে সেখানে পড়ে আছে;আমাদের দেশে কি এমন লোক নেই যে, এই অমূল্য হীরক খণ্ডগুলি উদ্ধার করে? লোকে দুর্ভিক্ষের দুঃখের কথা বলে, মহামারী দ্বারা লোকনাশের কথা আলোচনা করে; ভূমিকম্পের হৃদয় বিদার ঘটনার বিষয় আলাপ করে;কিন্তু যে লক্ষ লক্ষ লোক

ঈশ্বরবিহীন অবস্থায় এই জগৎ ত্যাগ করছে, তাদের অবস্থা যে আরও ভয়ানক, আরও শোচনীয়, তা কতজন চিন্তা করে? এইসমস্ত লোককে পরিত্রাণের বার্তা জানাবার জন্য দেশি বা বিদেশি সকল প্রকার লোকেরই প্রয়োজন। আসুন, আমরা সকলে এই প্রার্থনা করি —

"হে ঈশ্বর, তুমি বলেছ, সমস্ত জাতি তোমার কাছে একত্র হবে। অতএব চন্দ্রলীলার মতো যারা পরিত্রাণ পেয়ে স্বজাতির কাছে প্রচার করতে জীবন উৎসর্গ করবে, এমন লোক আমাদের দেশে উৎপন্ন কর।"

তাহলে মরুভূমিতেও গোলাপ প্রস্ফুটিত হবে এবং প্রভুর পুনরাগমনের সময়ে এ দেশের মণ্ডলী সৌন্দর্যে বিভূষিত হয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারবে। আমেন।